১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন •
২৲

আনন্দমেলা

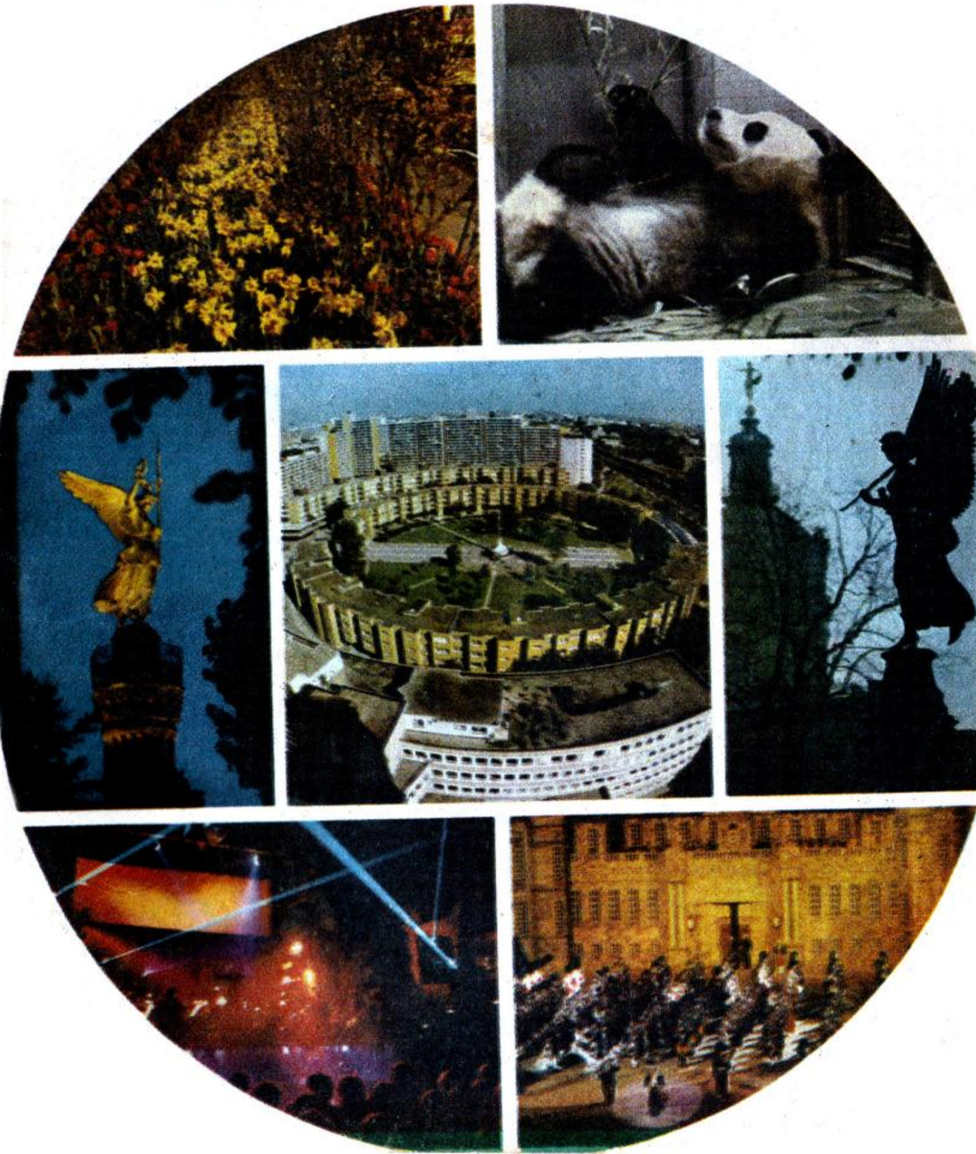

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

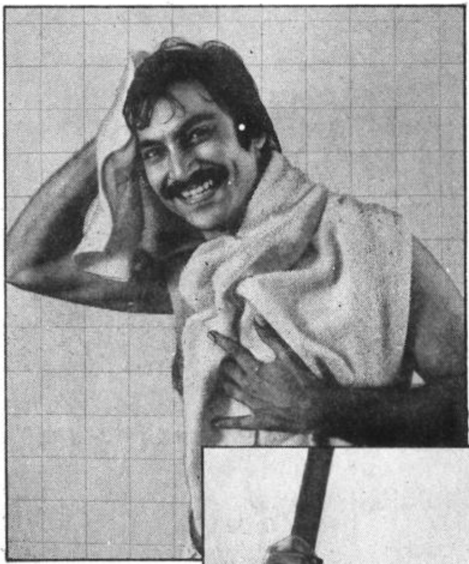

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান।

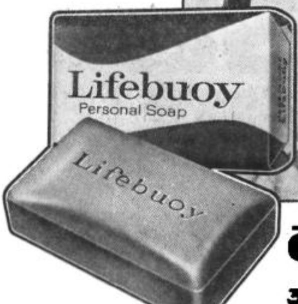

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-LP.10-1812 BG

আনন্দমেলা

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ • ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৮ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী
বার্লিনে । অহিভূষণ মালিক ৪

গল্প
মনোজের তিন সহযাত্রী । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১২
মাছ-ধরা । জীবন ভৌমিক ৩৬
ভূপতি ও আমি । মৃত্যুঞ্জয় সেন

উপন্যাস
সিসের আঙটি । বিমল কর ২০
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৩

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ২৫

ছড়া
বুঝে নাও। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮
বাপ্পার প্রথম ছড়া। কবিরুল ইসলাম ৫১

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫৫

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো
কলকাতায় সেরা টেনিস । অরিজিৎ সেন ৪৩
পূর্বাঞ্চলের দুর্ভাগ্য । রাজু মুখোপাধ্যায় ৪৪
কিট্টু চলে গেলেন । সুব্রত সিংহ ৪৭
প্রকাশের হ্যাটট্রিক । অশোক রায় ৪৯
ইভান লেন্‌ডলের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, ছবির মজা ৩৮,
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ : ছবিতে বার্লিন

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়
সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান
যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই
কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

বার্লিনে

অহিভূষণ মালিক

ভাবতে পারো ? ঝাঁকে-ঝাঁকে বোমারু বিমান সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে! আর, সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই, রাত্রি নেই হাজার-হাজার আগুনে-বোমা শহরের বুকে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসলীলা। একটাও বাড়ি আস্ত রইল না। যাঁরা মারা পড়লেন, তাঁরা তো বেঁচেই গেলেন। কিন্তু, যাঁরা বেঁচে রইলেন, তাঁদের একমাত্র চেষ্টা—ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ-সব ঘটেছিল জার্মানির বার্লিন শহরে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা ঝরছে, দূরপাল্লার কামানের গোলাও সেই সঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে বাড়ি-ঘর কল-কারখানা। গোটা বার্লিন শহর শ্মশানে পরিণত হবার পর থামল বোমা আর গোলার শব্দ। গত বিশ্বযুদ্ধের বর্ণনা আমি দিতে বসিনি, বলছি কেবল বার্লিন শহরেরই কথা। তা হলেও দু-একটা রাজনৈতিক ঘটনা না বললেই নয়।

হিটলারের নাৎসি বাহিনী, যারা মনে করত তাদের পরাজিত করতে পারে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই, তারা শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর রাশিয়ার সংঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে। রুশ বাহিনী পুব দিক থেকে বার্লিন শহর দখল করে এগিয়ে গেল একশো কিলোমিটারের মতো পশ্চিমে। আর, পশ্চিম থেকে পুবে এগোতে থাকল মার্কিন, ইংরেজ এবং ফরাসি বাহিনী। এক জায়গায় এসে রুশ আর এই তিন শক্তির মোলাকাত তো হবেই। দাঁড়িয়ে গেল তারা। রুশরা পিছোবেও না, পথও ছাড়বে না। একটা বোঝাপড়ায় আসা দরকার, নয়তো বুঝি আবার যুদ্ধ বাধে। ঠিক হল, যিনি যতটা জমি দখল করেছেন, তার ওপর লাঠি ঘোরানোর ভার তাঁরই। কিন্তু নাৎসিদের রাজধানী বার্লিনের ওপর অধিকার সবারই; কারণ সবাই মিলে আক্রমণ করেছিলেন বলেই তো হিটলারের পরাজয় ঘটেছে। বেশ, তাহলে বার্লিনকেও ভাগ করা হোক। পুব দিকটা দেখাশোনা করবে রুশ আর পশ্চিম দিকের শাসনভার রইল তিন শক্তি—মার্কিন, ইংরেজ আর ফরাসিদের হাতে।

পরে কিন্তু অবশ্য জার্মানিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অখণ্ড অবস্থায় নয়। দু-ভাগে ভাগ করা হল। ফেডেরাল রিপাবলিক অব জার্মানি আর জার্মান ডিমোক্র্যাটিক রিপাবলিক। ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, চেহারা

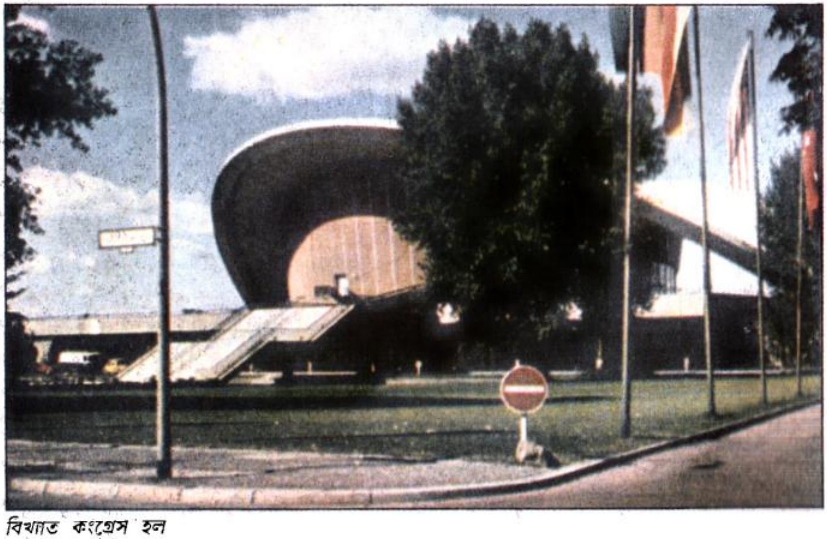

বিখ্যাত কংগ্রেস হল

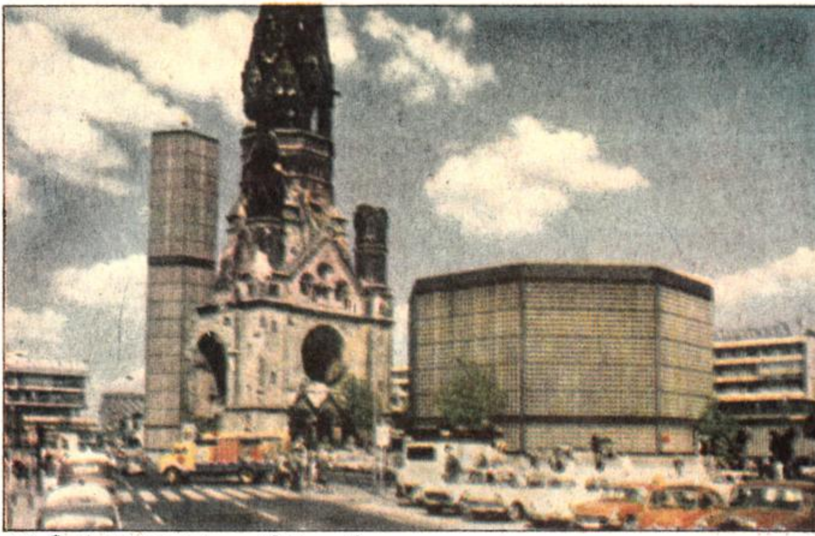

সেই গির্জা, বোমার আঘাতেও ধূলিসাৎ হয়নি

এক—তাহলেও তারা হয়ে গেল দুটি জাতি। বার্লিন শহর কিন্তু পুরোটাই জার্মান ডিমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অর্থাৎ পূর্ব জার্মানির মধ্যে। অনেকের ধারণা, পশ্চিম জার্মানি আর পূর্ব জার্মানির সীমারেখার মধ্যিখানে পড়ে বুঝি বার্লিন শহর দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এই ধারণা ভুল।

পশ্চিম বার্লিনের চারপাশে পূর্ব জার্মানি এলাকা, কতকটা দ্বীপের মতো অবস্থা। পশ্চিম বার্লিন এখনও চলছে মার্কিন, ইংরেজ আর ফরাসিদের পরিচালন ব্যবস্থায়, আর পূর্ব বার্লিন, যদিও তা জার্মান ডিমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের রাজধানী, আজও আছে রুশ অধীনে।

দুই বার্লিন ভাগ করা হয়েছে চওড়া আর উঁচু কংক্রিটের পাঁচিল দিয়ে। পশ্চিম বার্লিনে,

ব্রাইসকেলড প্রেস

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল !

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ– যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

কি ক'রে দেখুনঃ

- প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
- ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
- ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য !

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 R BN

পশ্চিম দিক থেকে লোকজন আসে বিমানে। জিনিসপত্রও ওই ভাবেই পাঠানো হয়। কিছু কিছু জিনিসপত্র অবশ্য ট্রাকে করে রাস্তা দিয়েও আসে, কিন্তু তাতে বাধা অনেক। যখন-তখন পূর্ব জার্মানির পুলিশের হাতে পড়তে হবে। পারমিট দেখাও, পাশপোর্ট দেখাও, গাড়ির মধ্যে কোনো মারাত্মক কিছু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা—সব খুঁজে দেখবে তারা। কিন্তু আশ্চর্য, এত অসুবিধা সত্ত্বেও, মাত্র এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে, বিধ্বস্ত বার্লিনকে পৃথিবীর একটি সেরা শহরে রূপান্তরিত করেছেন জার্মানরা। ঐতিহাসিক বাড়ি-ঘর সারানো হয়েছে। একটিমাত্র গির্জা, হাজার বোমাও যেটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারেনি, ভাঙাচোরা আর পোড়া অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। গির্জার চারদিকে জমজমাট অতিআধুনিক এলাকা—ইউরোপা সেণ্টার। প্রাচীন গির্জাটি ওইভাবে রেখে দেওয়ার কারণ কী জানো? মানুষকে ভয় দেখানো। আবার যুদ্ধ করেছ কি ওই অবস্থা হবে।

সে-আমলের অট্টালিকাগুলো সারানো হয়েছে। সেগুলির মধ্যে আছে মূল্যবান সব ছবি, আসবাবপত্র আর চারুকলা নিদর্শন। আগে যা যেমনভাবে ছিল, ঠিক সেইভাবে সাজিয়ে সংরক্ষণাগারে পরিণত করা হয়েছে অট্টালিকাগুলি। ওইরকম একটি সংরক্ষণাগার হল শারলোটেনবার্গ রাজপ্রাসাদ। মস্ত-মস্ত ঘর আর দালান। দেয়ালে প্রুশিয়ান রাজপরিবারের স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশুদের ছবি। গাইড সঙ্গে থাকলে অনর্গল বকে যাবে—ওই সব ছবি কাদের, কবে আঁকা হয়েছে, কার রাজত্বকাল ছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জার্মান ভাষা না জানলে একটা কথাও বুঝতে পারবে না। ইংরেজিতে কথা বলবে না গাইড।

শারলোটেনের চারদিকে মনোরম বাগান। সারা শহরেই ছড়িয়ে আছে বাগান আর ফুল। ভাস্কর্যও কম নেই। ব্রোঞ্জ কিংবা পাথরের মূর্তির সামনে থমকে দাঁড়াতে হবে পথ চলতে চলতে। নিখুঁত সব মূর্তি। ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং আরও নানা সুকুমার শিল্পবস্তু যুদ্ধের কবল থেকে কেমন করে বেঁচে গেল? এ-প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক। জার্মানরা শিল্পপ্রেমী জাত, প্রাণপাত করেও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁদের। ছবি, মূর্তি ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল যুদ্ধের সময়। নষ্ট যে কিছুই হয়নি তা নয়, অনেক হয়েছে, কিছু কিছু ভাস্কর্য মেরামতও করে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের কলকাতাতেও মিউজিয়াম আছে, আর্ট গ্যালারি আছে। কলকাতার মিউজিয়ামের দ্রষ্টব্যগুলি কিছু কম মূল্যবান নয়, কিন্তু বার্লিনের ডালেম মিউজিয়াম কিংবা ন্যাশনাল মিউজিয়াম সাজানোর গুণে দেখার মতো।

বোতিচেলি, রাফেল, ব্রুইখেল, রুবেন্স, রেমব্রাণ্ট কিংবা সেজান, ফানখখ, গগ্যাঁ, মানে, মোনে, রনোয়ার আঁকা ছবি কোথায় পাব আমরা কলকাতায়? ডালেম হল প্রাচীন আর মধ্য যুগের আর্টের মিউজিয়াম। ন্যাশনাল

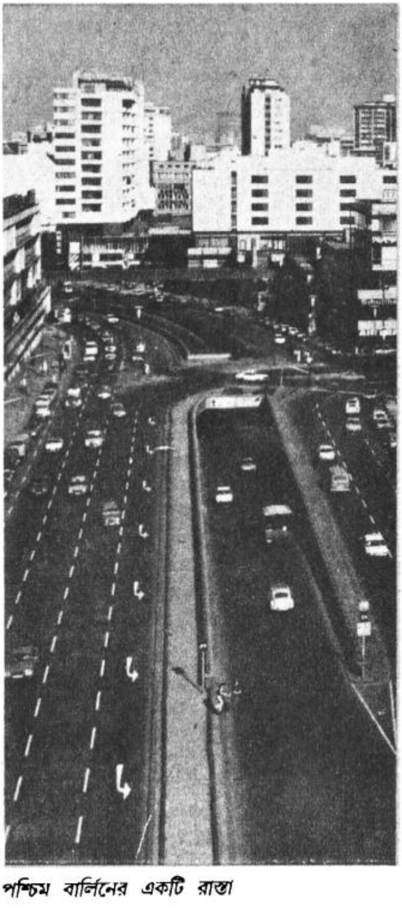

পশ্চিম বার্লিনের একটি রাস্তা

মিউজিয়ামে আছে উনিশ আর বিশ শতকের বিপ্লবী শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

বার্লিনের শুধু ডালেম বা ন্যাশনাল মিউজিয়ামেই নয়, ইউরোপের সব শহরেই আছে পৃথিবীর নানা শিল্পবস্তুর সযত্ন সংগ্রহ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরও নিদর্শন আছে ওই সব মিউজিয়ামে। অবিভক্ত বার্লিনের সবচেয়ে নামকরা স্থাপত্য শিল্পগুলি পড়েছে পূর্ব বার্লিনে।পূর্ব বার্লিনেরও বেশিরভাগ বাড়িঘর নতুন করে তৈরি। পশ্চিম বার্লিনে যেন দিন নেই, রাত নেই, সব সময় হৈ-হল্লা আর নাচ-গান। পূর্ব বার্লিনে তা নয়, লোকও কম, কলকলানিও কম। নতুন করে তৈরি হলেও ঐতিহ্য বজায় রেখেছে পূর্ব বার্লিনের সব বাড়ি। দেখে মনে হবে অনেক দিনের পুরনো শহর। শহরবাসীর আহ্লাদ-উচ্ছ্বাসের অবকাশ কম,

বার্লিনের একটি প্রধান সড়ক

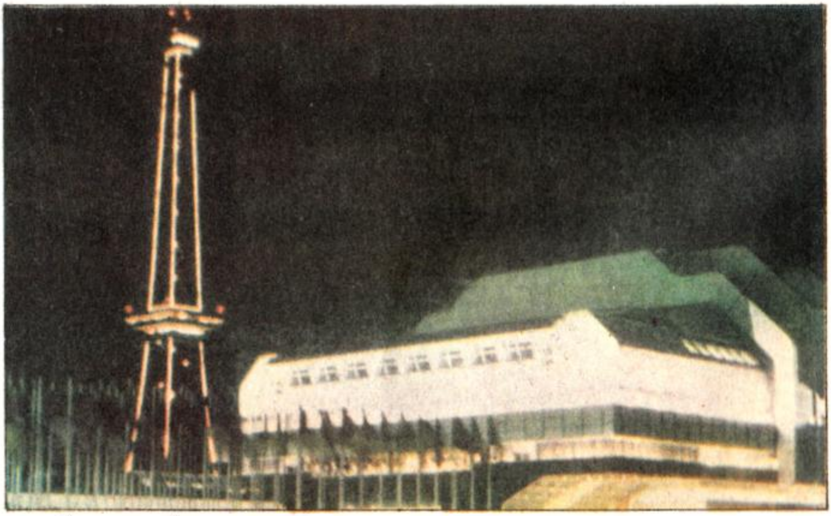

আন্তর্জাতিক কংগ্রেস কেন্দ্র

কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত সবাই। বেকার সমস্যা পূর্ব বার্লিনবাসীর মতে, একেবারেই নেই ওদেশে।

তোমরা বার্লিনের বিখ্যাত ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ গেটের কথা শুনেছ কিনা জানি না। গেটের মাথায় ব্রোঞ্জের মূর্তি চার-ঘোড়ার রথ চালাচ্ছেন। যে রাজপথে ওই গেট, সেই রাস্তা একসময় ছিল বার্লিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। নাৎসি সৈন্যরা এই রাস্তায় বহুবার মার্চ করেছে। আর যুদ্ধের আগে এ রাস্তায় শহরের সবচেয়ে বেশি গাড়িঘোড়া চলত। বার্লিনের রাজপ্রাসাদ থেকে ঐতিহাসিক পুরনো বার্লিনের কেন্দ্রে সোজা পৌঁছে দিত এই সড়ক। আজ কিন্তু তা বন্ধ। যে কুখ্যাত বার্লিন-প্রাচীর দুখণ্ড করেছে বার্লিন শহরকে, তা এই সড়ককেও দিয়েছে কেটে। আগে একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল এপারের লোকের ওপারে যাওয়া আর ওপারের

রাতের ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ

এয়ার-লিফট মেমোরিয়াল

পারবেন কি রাখতে চুপি চুপি ?

কোনো কোনো মহিলা মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ এগিয়ে চলেন আর জীবনের সাধ আহ্লাদের সামগ্রীও জুটিয়ে ফেলেন।

ঐ কাজটি কি করে সম্ভব— কানাড়া ব্যাংক আপনাকে তা জানাতে পারে।

আপনিও ঐ রকম একজন মহিলা হতে পারেন।

কানাড়া ব্যাংক-এর **বালক্ষেম ডিপোজিট** স্কীম আপনার মত ঘরণীদের জন্যেই—যাঁরা সংসার খরচ থেকে প্রতিদিন অল্প টাকা বাঁচিয়ে চুপি চুপি জমা করতে থাকেন আর হঠাৎ একদিন তাঁর সংসারকে তাক লাগিয়ে দেন !

এমন কি ঘরে প'ড়ে থাকা সামান্য খুচরো পয়সাও আপনার **বালক্ষেম**-এর টি. ভি. বাক্সে চুপি চুপি ফেলে রাখা যায়। আপনি নিজেও জানেন না—আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজটির বিনিময়ে ঘরে আসছে অবাক করার মত এক ভাণ্ডার !

আপনার হাতে আসবে যথেষ্ট টাকা, যা দিয়ে কিনতে পারবেন নিজের জন্যে জমকালো একটি শাড়ী, ছেলের জন্যে সাইকেল অথবা সংসারের জন্যে বিশেষ কোনো সামগ্রী !

আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজের বিনিময়ে আনুন—বিরাট লাভ !

আমাদের অন্যান্য ডিপোজিট স্কীম : **কামধেনু, নিরন্তর, বিদ্যানিধি, সেভিংস, রেকারিং ও ফিক্সড ডিপোজিট।**

কানাড়া ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)
সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের 1,300-রও বেশি শাখা আছে

GROWING TO SERVE · DEDICATED TO GROWTH · CANARA BANK

maa (S) CB 15 a Ben 81

লোকের এপারে আসা। বর্তমানে সে কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল।

পশ্চিম বার্লিনের লোকেরা বড় বেশি কথা বলে, চেঁচামেচি করে। রেস্তোরাঁগুলো ফরাসি কায়দায় চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে রাখে ফুট পাথের ওপর, আর খদ্দেররা দিব্যি সময় কাটিয়ে যায় কফির কাপে চুমুক দিয়ে আড্ডা দিতে দিতে। এমন দৃশ্য পূর্ব বার্লিনে বড় একটা দেখা যায় না। মানুষজন কেমন যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

গ্রীন ডিসট্রিক্টের চার দিকেই সবুজ। বড়-বড় গাছপালা প্রায় বন-জঙ্গলের রূপ ধারণ করেছে। একটি সুন্দর সাজানো বাগান আমাদের বোটানিকাল গার্ডেনের মতো। বাগানের মধ্যে ব্রোঞ্জের মস্ত মাতৃমূর্তি। মা কাঁদছেন। হাজার-হাজার সন্তান তাঁর বলি হয়েছে। একটু এগিয়ে, জমিটা সেখানে নিচু হয়ে গেছে, পর-পর চারটি সবুজ ঘাসের লন। বিশ হাজার বীর জওয়ানের শব ঢাকা আছে ওই লনগুলির নীচে। সামনে বিরাট এক যোদ্ধার মূর্তি, ব্রোঞ্জে তৈরি। যোদ্ধার হাতের তরবারিটি নিচু করা, অর্থাৎ আর যুদ্ধ নয়। যোদ্ধার কোলে একটি শিশু। শিশুটি নবজীবনের প্রতীক। বিজয়ী রুশ-সৈন্যরা বার্লিনের রাশি রাশি মৃতদেহের ভেতরে একটি জীবন্ত শিশুকে কুড়িয়ে পায়। যোদ্ধার কোলের ওই শিশু আর কেউ নয়, সেই কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুটি। শিশুটিকে বড় করে তোলার ভার নিয়েছিলেন প্রাহা শহরের একজন মহিলা। সেদিনের সেই শিশুটির বয়স এখন ৩২। তিনি পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। বছরে একবার আসেন ওই সবুজ ঘাসের লনে ফুল রেখে যেতে। আর তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ তাঁর শিশুমূর্তির দিকে। সদ্যবিবাহিত দম্পতিরাও আসে ফুল রাখতে ওই ঘাসের ওপর, এটা পূর্ব বার্লিনে একটা রীতি হয়ে গেছে।

পূর্ব বার্লিনেও মস্ত-মস্ত আর্ট মিউজিয়াম আছে; তার মধ্যে পেরগামেনন মিউজিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুল পার হয়ে ঢুকতে হবে মিউজিয়ামে। কারণ, মিউজিয়ামের চারদিকেই জল। মিউজিয়ামে ঢুকে পড়ার পরে ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্তম্ভিত হবে না এমন লোক কম আছে। ব্যাবিলন, আসিরিয়া, রোম

সেই গির্জাটি যেন রাতের প্রহরী

থেকে দেয়াল, ফটক, খিলান ইত্যাদি বড় বড় অংশ পর্যন্ত তুলে এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মিউজিয়ামে। পেরগামাম্ নামে এক সময় একটি শহর ছিল। গ্রীসে। এটি মূলত সেখানকার স্থাপত্যশিল্পের সংরক্ষণাগার—তাই এর নাম পেরগামাম্ মিউজিয়াম। বিশাল ব্যাপার।

যুদ্ধে এই মিউজিয়ামেরও খুব ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। আমাদের মা-দুর্গার সঙ্গে অসুরের লড়াইয়ের মতো ওলিমপিক দেবীদের সঙ্গে টিটানদেরও যুদ্ধ হয়। মা-দুর্গা আর গ্রীক দেবী আটেনা বোধহয় একই চরিত্র। টিটানরা ছিল দারুণ সুপুরুষ। যেমন নিখুঁত তাদের দেহের গঠন, তেমনই সুন্দর তাদের মুখশ্রী। আর দেবী তো পরমাসুন্দরী হবেনই। এই যুদ্ধের একটা-দুটো নয়, অন্তত বিশ-পঁচিশটা দৃশ্য আছে পেরগামেননের দেয়ালে। মূর্তিগুলির আকার জীবন্ত মানুষের সমান। গ্রীক ভাস্কর্যের কথা তোমরা অনেকেই হয়তো পড়েছ বা শুনেছ। বর্ণনা দিয়ে এই ভাস্কর্য বোঝানো যায় না, চোখে দেখতে হয়। বাহাদুরির চরম প্রকাশ করেছেন গ্রীক ভাস্কররা প্রতিটি কাজের মধ্যে।

মনোজের তিন সহযাত্রী

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

জংশন স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পরেও মনোজের মনটা তেতো হয়ে রইল। পুলিশের চাকরি তো সে নিজেও করে। মানুষের সামনাসামনি চেহারা নয়, বরং উলটো পিঠটা নিয়েই তার কাজ-কারবার। সবে তো বছর-পাঁচেক ঢুকেছে পুলিশের কাজে। এরই মধ্যে বদবুদ্ধির নানান রকমফের দেখে স্কুল-মাস্টারের ছেলে মনোজের হাঁপ ধরার অবস্থা। কিন্তু ট্রেনে তার বিহারি সংস্করণটির কথাবার্তা, হাবভাব মনটাকে আরও খিচড়ে দিল।

তবে চোখ বটে লোকটির। একেই বলে পুলিশের চোখ। মনোজের গায়ে উর্দি ছিল না। তার যা কাজ তাতে পুলিশের পরিচয়টা চাপা থাকাই ভাল। তবু ধরা পড়ে গেল। গায়ে পড়ে আলাপের চেষ্টায় ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে পার পেল না।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় দোসরা প্যাসেঞ্জার বলতে ভারীসারি চেহারা, রগচাঁছা চুল, মোটা ভুরু, আরও মোটা গোঁফ, মাঝ-তিরিশ বয়েসের লোকটি। শার্ট আর ট্রাউজার্সের কাপড়ে রীতিমত চেকনাই। রিস্ট-ওয়াচটার দাম মনোজের দু-মাসের মাইনের সমান। অন্য দিকে মুখ ফেরাবার আগেই লোকটার হাসি-হাসি দু চোখের নজর সট্ করে পাকড়ে ফেলল মনোজকে। এর পর অন্য দিকে ঘাড় ফেরালে অভদ্রতা হয়। বাধ্য হয়ে মুখের নির্বিকার ভাবটায় একটু ঢিল দিল মনোজ।

“কাঁহা যাইয়েগা,” হাসিটা আর একটু ছড়াতেই লোকটির চোখদুটো কুঁচকে আতার বিচি। কিন্তু সেই আতার বিচির মধ্যেও কুচুটে

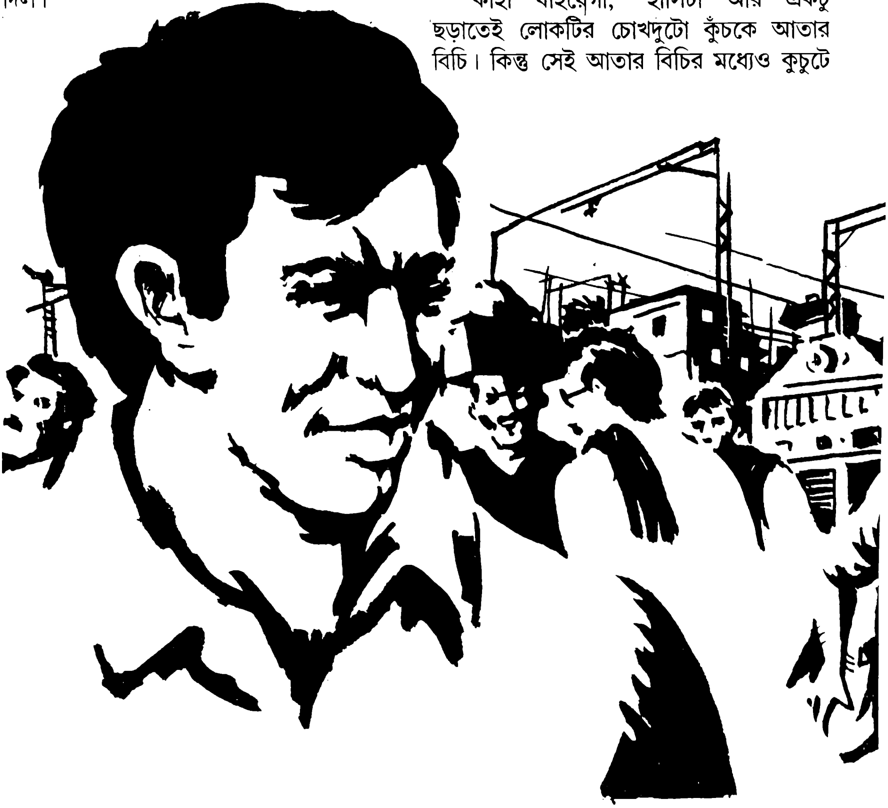

বুদ্ধির ছিটে। মনোজের নজর এড়াল না। চাকরি তাকে শিখিয়েছে, এ-রকম চোখ যাদের, তারা সোজা লোক হয় না।

"এই যাব খানিক দূরে," যথাসাধ্য হিন্দিতে দায়সারা জবাব দিল মনোজ।

"আপ কলকাত্তাসে আ রাহা হ্যায়," সঙ্গে-সঙ্গে দু নম্বর প্রশ্ন। মুখটা তেমনি হাসির আড়ালে ঢাকা। চোখে কিন্তু ধড়িবাজির বাসা।

আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো। একরাশ বিরক্তি মনোজের জবাবটা আটকে দিল। বাঙালি হলেই কি কলকাতার বাসিন্দা হতে হবে নাকি। মনের চিড়বিড়ে ভাবটা চেপে মনোজ পালটা প্রশ্ন করল, "আপ কাঁহা যাইয়েগা"। সঙ্গে ফাউ হিসেবে একটা মোলায়েম হাসি।

লোকটির হাসিতে এতক্ষণ শব্দ ছিল না, এবারে যোগ হল। তবে হা-হা হো-হো হি-হি নয়। বিশ্রী খ্যা-খ্যা গোছের একটা আওয়াজ হাওয়ার ধাক্কা খেতে খেতে লম্বা হয়ে বেরোল। সেই হাসির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনোজের মনের মধ্যে সমানে চটপটি ফোটা। হাসি থামল এক সময়। মনোজ তাকিয়েই আছে।

"আপ তো পুলিশ-অফিসার হ্যায়," দুম করে বলল লোকটি। রুমালে চোখ মুছল, কিন্তু হাসিটা বাঁচিয়ে।

এবারে মনোজের তাজ্জব হবার পালা। অবাক হল ভেতরে-ভেতরে। বাইরে আর দেখাল না সেটা। এক লহমায় নিজের সাধারণ ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট-পরা শরীরের দিকে তাকিয়ে ভাবল কোথায় পুলিশ শব্দটা লেখা আছে। চট করে কোনও কথা জোগাল না মুখে।

"আপনার পায়ে জঙ্গল বুট, লম্বা-পাল্লা জলকাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়েছেন," খানিক হিন্দি, খানিক ইংরিজিতে লোকটি বলে চলল, "আপনার বয়েসের এত তাগড়াই চেহারার জোয়ান, পুলিশ বা মিলিটারির লোক না হলে জঙ্গল বুট পরে না কখনও। আর্মির লোক হলে আপনার চুল আরও ছোট হত। হাল আমলের পুলিশের নওজোয়ানরা আর আগের মতো ছোট করে চুল ছাঁটে না। তাই আন্দাজ করলাম আপনি পুলিশ। আর আপনার খুবসুরত ধারালো চেহারা বলে দিচ্ছে আপনি পশ্চিম বাংলার দেহাতের নয়, কলকাতার পুলিশ। বিহারে কোনও তদন্তের

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টফলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন :

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

কাজে এসেছেন।"

এলিমেন্টারি ওয়াটসন, মনে মনে কথাটা চট করে আউড়ে নিয়ে মনোজ জিজ্ঞেস করল তেমনি হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে, "এত সাফা নজর যখন আপনার, আপনিও নিশ্চয়ই পুলিশ।"

"কারেক্ট," লোকটি বলল, "সাব-ইন্সপেক্টার রামাশিস দুবে অব বিহার সি. আই. ডি.।" মনোজের বার্থে উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটি।

মনোজও সেই হাতে হাত মিলিয়ে বলল, "সাব-ইন্সপেক্টার মনোজ মুখার্জি অব ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, ক্যালকাটা পুলিশ।"

দুবে পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে ধরল মনোজের দিকে। মনোজের নিজের ব্র্যাণ্ড নাম্বার টেন। তবু একটু দোনোমোনা করে নিল একটা সিগারেট। ফস করে জ্বলে উঠল দুবের গ্যাস-লাইটার।

মনোজ ভাবল হয় বিহার পুলিশের অফিসারেরা অনেক বেশি টাকা মাইনে পায়, নয় ওখানকার লোকজন ওদের বেশ দুধেভাতে রেখেছে। দুবেই আবার কথার খেই ধরল। নানান পুলিশি গল্প যা শুনতে মনোজের একদম ভাল লাগে না। দুবে বলছিল চুরি, ডাকাতি, খুনখারাবি বেড়েই চলেছে। মনোজের মনটা সিঁটিয়ে গেল। পাঁচ বছরেও মনেপ্রাণে পুলিশ হয়ে উঠতে পারেনি। এই চাকরি করে লাভের মধ্যে পুরনো বন্ধুবান্ধব কেমন যেন দূরে সরে গেছে।

আর খুনখারাবি? প্রথম খুনের তদন্তের কথাটা মনে হলে এখনও গায়ের মধ্যে শিরশির করে। ঘরের ভেতর পা দিতে আর ইচ্ছে করছিল না। সঙ্গে ছিলেন একজন পোড়-খাওয়া ইন্সপেক্টর। বললেন, বাইরে কেন, ঘরের মধ্যে এসো। এক নজরেই যা দেখবার তা দেখেছিল। নাকে লেগেছিল একটা অদ্ভুত গন্ধ। সেই প্রথম মনোজ জানল কাঁচা রক্তেরও একটা গন্ধ আছে। ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। তবু ধাওয়া করে এল সেই গন্ধটা। তারপরেই হুড়হুড় করে বমি। সঙ্গের কনস্টেবলরা হাসছিল ওর অবস্থা দেখে। এই ধাক্কার পর অনেক তদ্বির-তদারক করে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি-ফ্রড সেকশানে বদলি। মন্দের ভাল। এক জালিয়াতির আসামির খোঁজেই বিহারের এই ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরের যাত্রী মনোজ। কলকাতা থেকে পাটনা। সেখান থেকে এই ট্রেনে আর এক জংশন স্টেশন। ফের গাড়ি বদলে খাবাড়িয়া না ছাবাড়িয়া বলে এক স্টেশনে নামতে হবে। থানা সেখানেই। তারপর আবার মাইল-দশেক দূরে দুধিয়াগাঁও, যেখানে সেই ফেরারি জালিয়াতের ঘাপটি মেরে থাকার খবর আছে। কথায় কথায় মনোজ দুবেকে জানাল কিসের ধান্দায় এখানে আসা।

দুবে বলল, "কোনো চিন্তা করবেন না। খাবাড়িয়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ মহেন্দ্র সিং আমার ব্যাচ মেট। খুব চমৎকার দিলদরিয়া লোক। আমার কথা বলবেন ওকে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। সব বন্দোবস্ত মহেন্দ্র সিং করে দেবে।" বলেই ফের চলে গেল খুনজখমের গল্পে। যে খুন যত বীভৎস, তার খুঁটিনাটি বর্ণনায় তত উৎসাহ দুবের। গা ঘিনঘিন করছিল মনোজের। দু-একবার কথা পালটাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেলাইনে পা দেবার লোক দুবে নয়। ঘুরে-ফিরে সেই এক টপিক। মনোজ অনেকবার জানলা দিয়ে খেত-খামারের ওপারে ফুরিয়ে আসা বিকেলের দিকে মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করল। তবু গল্পের এক-একটা রক্তাক্ত টুকরোর খুচখাচ মনের মধ্যে ঢোকা আটকাতে পারল না।

এক সময় এসে গেল জংশন স্টেশন। নামল দুজনেই। এক মার্কামারা ভুঁড়িদার শেঠজি সবগুলো দাঁত দেখিয়ে দুবের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল। যেন ঠিক রামভক্ত হনুমানটি। জানাল, স্টেশনের বাইরে গাড়ি হাজির আছে। এখন 'নিস্‌পেক্‌টার সাব' যদি মেহেরবানি করে তার গরিবখানায় একটু পায়ের ধুলো দেন।

দুবে মনোজের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল, "আপনার গাড়ি আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে। সাড়ে-আটটার মধ্যে খাবাড়িয়া পৌঁছে যাবেন। রাতটা থানার ইনসপেকশান রুমে থাকুন মহেন্দ্র সিংয়ের মেহমান হয়ে।" বলে ডানহিলের প্রায় আস্ত প্যাকেটটা জোর করে মনোজের হাতে গুঁজে দিয়ে শেঠজির সঙ্গে চলে গেল দুবে। রেখে গেল একরাশ তিতকুটে ভাব। থিতোতে একটু সময় নিল।

বিহারের ট্রেন এমনিতে টাইম-টেবলে লেখা

ডালিমা বিস্কিট উৎকৃষ্টতার জন্য বছরের পর বছর বহু আন্তর্জাতিক সোনার মেডেল জিতেছে।

'লে মণ্ড' (বিশ্ব) সিলেক্সন সোনার মেডেল জিতেছে :

১৯৭৭ সালে ব্রুসেল্‌সে
১৯৭৮ সালে জেনেভায়
১৯৭৯ সালে প্যারিসে
১৯৮০ সালে ভিয়েনায়
১৯৮১ সালে এ্যামস্টারডমে
ডালিমা বিস্কিটের জুড়ি নেই

সুবর্ণ-স্বাদের ডালিমা বিস্কিট তুলনাহীন।

স্বাদে ভরা খাস্তা কোকোনাট কুকিস–যত খাবে তত মজা। মজাদার পুষ্টিকর গ্লুকোজ বিস্কিট–এ'তে সবচেয়ে বেশী পরিমানে গ্লুকোজ আছে। সোনার মেডেল পাওয়া এ'টাই একমাত্র গ্লুকোজ বিস্কিট।

ডালিমার ক্রীম বিস্কিট চমৎকার নতুন স্বাদে ভরা–অরেঞ্জ ক্রীম, পাইনএ্যাপেল ক্রীম, বাটার ক্রীম। স্বাদে ও গন্ধে তাজা। এ'ছাড়া আছে আরো নানা রকমের স্বাদের বিস্কিট —নোনতা এবং ক্র্যাকার্স।

পাঞ্জাবের সোনা-রংয়ের উৎকৃষ্ট গম দিয়ে তৈরী হয় এই বিস্কিট।

এই বিস্কিটের তাজা স্বাদের জন্য সবসময় পাঞ্জাবের পুষ্টিকর এবং সবচেয়ে সেরাজাতের সোনা-রংয়ের গমই ব্যবহার করা হয়।

ডালিমার কারখানাগুলি পাঞ্জাবেই অবস্থিত।

উত্তর ভরেতে ৪০-এর ও বেশী বছরের পরিচিত ও জনপ্রিয় এই ডালিমা বিস্কিট আজ এসেছে আপনার জন্য।

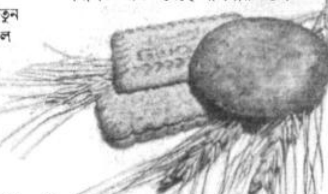

MONDE SELECTION BRUXELLES SELECTION DE LA QUALITE

উৎকৃষ্ট বিস্কিটের নির্মাতা
ডালমিয়া বিস্কিট প্রাইভেট লিমিটেড

HTD-DBL-7030

সময় মেনে আসা-যাওয়া করে না। তবু মনোজের ভাগ্য ভাল। খাবাড়িয়া যাবার ট্রেন মিনিট-দশেকের বেশি লেট করল না। স্টেশনে বইয়ের দোকান থেকে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিন কিনেছিল মনোজ। সেই ম্যাগাজিন, এক ভাঁড় চা আর দুবের দেওয়া ডানহিলের প্যাকেট থেকে নেওয়া গোটা-দুই সিগারেটের দৌলতে চল্লিশ মিনিট সময়ের বোঝাটা টেরই পেল না মনোজ।

যে ট্রেন খাবাড়িয়া বলে একটা বিচ্ছিরি নামের জায়গায় যায় তাতে রাজধানী এক্সপ্রেসের জৌলুস আশা করা যায় না। তবু ট্রেনের চেহারা দেখে একটু দমে গেল মনোজ। একটা লজঝড়ে পুরনো স্টীম ইঞ্জিন টেনে নিয়ে এল কতকগুলো তার চেয়ে রদ্দি রঙচটা বগি। কামরার গায়ে বিহারের রাখাল বালকরা আবার কাদা ছুঁড়ে নকশা করে দিয়েছে। কিছু কামরার জানলায় অন্ধকারের চৌখুপি। কোনো কোনোটায় আবার মিটমিটে আলো। ফার্স্ট ক্লাস আর আলো—এই দুটো একসঙ্গে একটা কামরায় মিলতেই উঠে পড়ল মনোজ। ফাঁকা। সঙ্গে মালপত্র বলতে একটা ছোট স্যুটকেস আর জলের বোতল। স্টেশনের দিকে পিঠ-ফেরানো একটা বার্থে বসে পড়ল। প্লাটফর্মের জোরালো আলোয় ঘড়ি দেখল—প্রায় পৌনে সাতটা। খাবাড়িয়া প্রায় দু-ঘণ্টার ধাক্কা। অবশ্য ট্রেন যদি আর লেট না করে। আশার কথা, ট্রেনটা সব স্টেশনে থামে না। এক-এক টানে দুটো-তিনটে করে স্টেশন টপকে যাবার কথা। চারবারের বার থামলেই খাবাড়িয়া।

একটা ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্মটা পিছিয়ে যেতে থাকল। স্টেশনের শেষে ইঞ্জিনের জল খাওয়ার কলটা থেকে আচমকা খানিকটা জল ছিটকে গায়ে পড়তে অল্প একটু চমকাল মনোজ। হাসল ব্যাপারটা বুঝতেই। আধ ইঞ্চির জন্যে মনোজকে পুরোপুরি ছ-ফুটি বলা যায় না। চেহারাটা দেখতে আর কাজে, দুইয়েই বেশ মজবুত। পুলিশ টীমে ফুটবল খেলেছে বছর-তিনেক। মোহনবাগানকে একবার গোল দেবার সুবাদে কাগজে নামও বেরিয়েছিল। হাতের কবজিতে এখনও দারুণ জোর। গোটা লালবাজারে ওকে পাঞ্জার লড়াইয়ে হারাতে পারে এমন বোধহয় কেউ নেই। কিন্তু আর কেউ জানুক আর নাই জানুক, মনোজ বোঝে যে, ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হল মন। অন্য অফিসাররা আসামিদের চড়টা-চাপড়টা মারেন কখনও সখনও। মনোজ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। অ্যান্টি-ফ্রডের অফিসার-ইন-চার্জ, ইন্সপেক্টার বর্ধন মনোজের নাম রেখেছেন করুণাময়। হজম করা ছাড়া উপায় নেই। মনোজ জানে পুলিশের চাকরিতে এখনও সে মানানসই হয়ে উঠতে পারেনি।

বাইরে তাকিয়ে মনোজ বুঝল আকাশে কৃষ্ণপক্ষের রাজত্ব। মেঘ আছে কি না কে জানে। কিন্তু তারাদেরও তো পাত্তা নেই। সব কিছু অন্ধকারের জ্যাবড়া তুলিতে ল্যাপাপোঁছা। কামরায় আলোর অবস্থা খুবই কাহিল। একটি কড়ে আঙুল সাইজের মোমবাতির আলো নড়াচড়া না করলে যা হয়, তাই। ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা বৃথা। আবার ঘড়ি দেখল। সবে মিনিট-সাতেক কেটেছে। মনোজের মনে হল একটা স্পেস ক্যাপসুলের মধ্যে ও একা। ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। ভাবতেই খেয়াল হল এ-রকম একদম একা অবস্থায় ও অনেক দিন পড়েনি। ওর চাকরির জায়গা লালবাজার, তার বাইরে কলকাতা শহর, নিজের বাড়ি—সবই তো অল্পবিস্তর লোকজনে ভরা। পুরোপুরি একা থাকার সময়টা রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে কেটে যায়। টেরই পায় না।

এখন খাবাড়িয়া না আসা পর্যন্ত এই কামরাটা মনোজের জন্যে গারদখানা। যে এলাকার ট্রেন তাতে আর অন্য ফার্স্ট ক্লাসে প্যাসেঞ্জার উঠবে কি না সন্দেহ। অস্বস্তিতে পড়ল মনোজ। এতটা সময় একা-একা কাটানো। কামরার বাইরে অন্ধকার, মধ্যে মিটমিটে আলো। ট্রেনের চাকার একটানা শব্দ। একরাশ ভাবনা একা পেয়ে মনোজকে ছেঁকে ধরল।

বাবার শরীরটা ভাল নেই। বছর-দুই আগে মনোজের মা মারা যাবার মাসখানেকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রে একটা বড় গোছের গোলমাল। সেই ধকল আস্তে আস্তে সামলে উঠলেও মনোজের বাবার শরীর আর মন দুই-ই বেশ কমজোর। সরকারি ফ্ল্যাটের লটারিতে নাম উঠল না। দরখাস্তর টাকাটাই বরবাদ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর লটারিতে নাম ওঠার আশা মনোজ করেওনি,

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার
ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই
ভারী মজার। এই একটা উপহার
আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে।
ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো
ঐখানে।
ভাগ্যিস, মার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল।
অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ
দিই—আমার জমা পয়সা বছর
বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।
UCO/CAS-69/80 BEN

নাম ওঠেওনি। দাদার একটা প্রেস আছে। লোড-শেডিংয়ের খানা-খোঁদলে পড়ে সে প্রেসও প্রায়ই খোঁড়া। পরের ভাইটা বি. এ. পাস করে এক ধার থেকে চাকরির দরখাস্ত করে যাচ্ছে। ছোট বোনটা ক্লাস টুয়েলভে। পড়াশোনার সময়েও গল্পের বই পড়তে ভালবাসে। ভাইবোনদের মধ্যে সকলের বড় মনোজের দিদির একটা পুরনো এবং পাকা চাকরি আছে টেলিফোন-ভবনে। দিদির এবং মনোজের চাকরির কল দিয়ে যা হোক কিছু টাকাপয়সা মাস গেলে বেরোয়, সংসারটাকে চালু রাখে। থাকার বাড়িটা জঘন্য হলেও ভাড়াটা আদ্যিকালের। সেখানেও খানিকটা সুরাহা।

অন্ধকার চিরে ট্রেনের ইঞ্জিনটা একটানা হুইশ্‌ল দিল। সেই শব্দের ধাক্কায় মনোজ আবার পুরোপুরি ফাঁকা কামরায় একা যাত্রী। দুবের দেওয়া ডানহিলের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরাল। একটু বেশি সিগারেট খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আজ। ট্রেনের চাকার লহরা ঢিমে হয়ে আসছে। কামরাটা হঠাৎ দুলে উঠল। পর-পর কতগুলো ঘটাং-ঘটাং শব্দ। স্টেশন আসছে বোধহয়, যেখানে ট্রেনটার প্রথম দম নেবার কথা।

ভাবতেই মনোজ একটু চাঙ্গা হয়ে বসল। স্টেশন মানেই লোকজনের ওঠানামা, আনাগোনা। ট্রেন থামল বলেই হোক আর প্লাটফর্মের কটা কেরোসিনের বাতি দেখেই হোক, মনোজ বুঝল এটা একটা স্টেশন। লোকজন বিশেষ নজরে পড়ল না। একটা চা-ওয়ালার ডাক পর্যন্ত নেই। দেহাতি ভাষায় কোথায় কে যেন চেঁচিয়ে কী বলল। অনেক দূর থেকে এল একটা অস্পষ্ট জবাব। তারপরেই একটানা ঝিঝির ডাক। মনোজের সামনে নিচু প্লাটফর্মে একটা কেরোসিনের বাতি খাবি খাচ্ছে।

একটু পরেই ট্রেনটা স্টেশনের মায়া কাটাল। সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল মনোজ। অমনি ওত-পাতা অন্ধকার আবার বাইরের রাজ্যের দখল নিল। আবার একা মনোজ। শুরু হল ফের আজেবাজে চিন্তার আনাগোনা। বাস রে বাস, এতনা খুন কভি নেহি দেখা, একদম খুন কি দরিয়া—দুবের গল্পের একটা রক্তমাখা টুকরো হঠাৎ ছিটকে এল মনোজের দিকে। মনোজ সেটা তাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। মনের মধ্যে একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি।

মনোজ বাঁদিক থেকে ডানদিকে একশো আশি ডিগ্রী ঘাড় ঘোরাল। উলটোদিকের সীটে রেকসিন ছিঁড়ে চট, কোথাও আবার চট ছিঁড়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। মনোজের মনে হল কামরার মধ্যে গরমটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। জানলা দিয়ে আসা হাওয়া ভেতর পর্যন্ত আর পৌঁছচ্ছে না। কেমন একটা চামশে গন্ধ। প্রথমে অল্প, তারপর বেশি। অদৃশ্য ধোঁয়ার কুণ্ডলি হয়ে ভরে ফেলছে কামরাটা। আবার ডাইনে বাঁয়ে চাইল মনোজ। কিছু নেই। নাকের কাছে ঘন হয়ে আসছে সেই বিচ্ছিরি গন্ধটা। মনোজ এবার ঘাড় তুলে ওপর দিকে তাকাল।

অমনি বুকের মধ্যে একটা হাতুড়ির বাড়ি। মনোজের থেকে হাত-দেড়েক উঁচুতে মস্ত একখানা মুখ। সেই মুখ থেকে ঠিকরে বেরোনো ভীষণ রাগী গোল-গোল দুটো চোখ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। দু-ঠোঁট উলটে গুটিয়ে গিয়ে দু-সার হলদে বড়-বড় দাঁত ওপর-নীচ দু-পাটি একসঙ্গে চেপে রয়েছে। মানুষের মুখ ওরকম কখনো হয় না। একটা ভয় দেখানো দুঃস্বপ্নের মুখোশ। ঘুমের মধ্যে দেখলেও যে কোনও লোক চিৎকার করে জেগে উঠবে। অথচ মনোজ জেগেই আছে। তার জেগে-থাকাটা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি ওই মুখখানা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি: দেবাশিস দেব

সাহস কাকে বলে? সাহস মানে কী? অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ হল বিখ্যাত লেখক জি কে চেস্টারটনের সংজ্ঞাটি। চেস্টারটন সাহেব সাহসের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে :"একই সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্যে প্রবল বাসনা এবং মৃত্যুর জন্যে সদাপ্রস্তুত থাকা, এই পরস্পর-বিরোধী বিষয় দুটির একত্র অর্থ করলে সাহস শব্দটি পাওয়া যাবে।"

আগে যা ঘটেছে: শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আংটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে-ই হয়তো কোনো ওষুধ মেশাত তার খাবারে। ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রাম-ফর্মের সন্ধান মেলে। সান্যালের বাসে উঠে সিংহিবাবু জখম। তিনি বলেন, ভবতোষের আসল নাম শ্যামসুন্দর; সে শিশিরদেরই প্রতিশোধলিপ্সু আত্মীয় এবং তারই প্ররোচনায় তিনি ওষুধ খাইয়ে পাগল করতে চেয়েছিলেন শিশিরকে। বাড়িতে ফিরে শিশির বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়। বন্দুক নাকি পুলিশ-অফিসার হেমবাবু ছুঁড়েছেন। তারপর...

॥ ২৮ ॥

বংশী মুচকি-মুচকি হাসছিল। তার হাসি দেখে মনে হবে, সে যেন মস্ত ভেলকি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শিশিরদের।

নিজেকে সামলে নিল শিশির; বাবুর দিকে তাকাল একবার। তারপর বংশীর দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "হেমবাবুকে আমরা দেখেছি। তিনি হাসপাতালের মাঠে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।"

"জানি।"

"উনি গুলি ছুঁড়লেন কেন?"

বংশীর আঙুলের ডগায় নস্যির টিপ তৈরি ছিল। নাকে গুঁজে জোর টান মারল। টান দেখে মনে হবে, নেশাটা যেন ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকল। ক'মুহূর্ত চুপচাপ। রুমালে নাক মুছে ছলছল চোখে বংশী বলল, "হেমবাবু খানিকটা আগে এসেছিলেন। স্টেশনের দিকে গিয়েছেন। কালকের কথা বললেন। তোমরা দু জনে সিংহিবাবুর বাড়িতে বসে আড্ডা জমিয়েছিলে।"

মাথা নাড়ল শিশির। "হ্যাঁ; কিন্তু তার সঙ্গে গুলি ছোঁড়ার সম্পর্ক কী?"

"তার সঙ্গে নেই; তবে সিংহিবাবুর সঙ্গে আছে।"

"মানে?"

"গুণ্ডা-মতন একটা লোক সিংহিবাবুর বাড়ির সামনে ঘুরছিল। হেমবাবুর চোখে পড়ে যায়। লোকটা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাঁচিল টপকাবার চেষ্টায় ছিল। হেমবাবুর নজরে পড়ে যাওয়ায় তিনি ওকে হাঁক মেরে দাঁড়াতে বলেন। লোকটা বর্শা ছুঁড়ে হেমবাবুকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। তাড়া খেয়ে লোকটা পুকুরের দিকে দৌড়তে শুরু করে। হেমবাবু গুলি ছোঁড়েন। ধরা যায়নি।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে সহজ হল। শিশির আর বাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সিংহিবাবু মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন, তবে ভুল হয়েছে অন্য জায়গায়, যে-লোকটা সিংহিবাবুর বাড়ি চড়াও হতে গিয়েছিল সে গুলি ছোঁড়েনি, গুলি ছুঁড়েছেন পুলিশের হেমবাবু।

এতক্ষণ বাবু আর শিশির দোকানের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বসেনি। এবার ভেতরে ঢুকে বসল।

বাবু বলল, "লোকটা পালিয়ে গেল?"

বংশী বলল, "সিংহিবাবুর বাড়ির পেছন দিকে মাঠ, পুকুর। গাছপালাও আছে। পালানো সহজ। একবার ছুট লাগাতে পারলে কে ধরবে! চার দিক ফাঁকা।"

শিশির কিছু ভাবছিল। বলল, "হেমবাবু রাত্তিরবেলায় ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কেন বংশী?"

"মাঝে-সাঝে ঘোরেন। কাল ঘুরছিলেন অন্য কারণে। বোধ হয় খবর পেয়েছিলেন ডাকাত দলের কেউ ওদিকে ঘোরাফেরা করছে।"

"তোমায় বলেছেন হেমবাবু?"

"কথা থেকে তাই মনে হল!"

"সিংহিবাবুর ওপর চোখ রাখার জন্যে নয় তা হলে?" বাবু বলল।

"না।"

শিশির বুঝতে পারছিল বংশীর কাছে নতুন খবরগুলো লুকিয়ে রাখা যাবে না। সেটা উচিতও নয়। বংশী তাদের বন্ধু। যথাসাধ্য সাহায্য করছে সে শিশিরকে। সিংহিবাবু বংশীকে পছন্দ না করতে পারেন, কিন্তু শিশিররা বংশীকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া বংশীরও জানা উচিত সিংহিবাবুকে সে যা ভাবে তিনি মোটেই তা নন।

"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। বলছি। আগে চা খাওয়াও।"

বংশী একটু দেখল শিশিরদের, তারপর উঠল। চায়ের কথা বলতে চলে গেল।

শিশির বাবুকে বলল, "বাবুদা, বংশীকে পুরো ব্যাপারটা বলে ফেলি। ও বোধ হয় সিংহিবাবুর অ্যাকসিডেন্টের খবরও জানে না।"

বাবু বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

একজন খদ্দের এসে হাজির দোকানে। বংশীকে দেখতে না পেয়ে কিছু বলল।

"এখানেই গেছেন। আসছেন..." বাবু বলল।

লোকটা বেহারি। বাংলা বুঝতে অবশ্য তার কষ্ট হল না। দোকানের চৌকাঠে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

সামান্য পরেই বংশী দোকানে এল। কথা বলল লোকটার সঙ্গে। কিছু কিনতে আসেনি সে। রেলের টিকিটবাবুর কাছ থেকে কিসের খবর দিতে এসেছে। খবর দিয়ে চলে গেল।

শিশির বলল, "তোমায় ক'টা খবর দেব, চমকে উঠো না।"

বংশী হাসল। "সিংহিবাবুর খবর?"

"কেমন করে বুঝলে?"

"যেরকম জমিয়ে বসেছ ওখানে, বুঝতে বাকি থাকে না।"

বাবু বলল, "না বংশী, এ খবর মামুলি নয়। দারুণ খবর।"

বংশী শিশিরের দিকে তাকাল।

শিশির কোনো ভূমিকা করল না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব বলে গেল।

বংশী অবাক হয়ে শুনছিল। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে তার বিস্ময় জানাচ্ছিল।

ততক্ষণে চা এল। চা আর গরম কুচো নিমকি।

বংশী বলল, "হেমবাবু ঠিকই বলছিলেন। বলছিলেন, সিংহিমশাইয়ের বাড়িতে

মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়া মানে আপনার চুলেরও দফারফার শুরু...

চুল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার ওপরের এই চামড়ার যদি ঠিকমত পুষ্টিসাধন না করেন তো, সেটি শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে। আর তার ফলে মাথায় খুস্‌কি হতে থাকবে, চুল চিরে-চিরে যাবে ও নিষ্প্রভ, নির্জীব হয়ে পড়বে...

আর সেই কারণেই আপনার দরকার বিশেষ ফর্মূলায় বানানো এমন এক হেয়ার টনিক যা মাথার এই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে।

HTM-PIL-2639-1

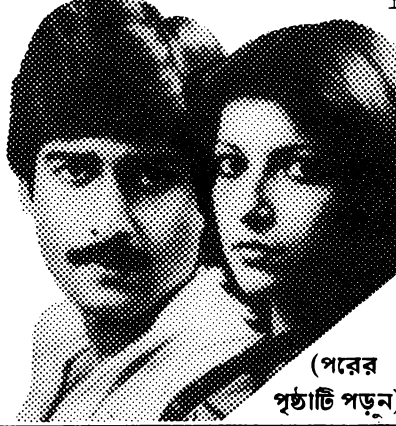

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)

চোর-ডাকাত ঢোকার তো কারণ নেই, তবু লোকটা ও-বাড়ির পেছনে কী করছিল?"

"লোকটা চোর-ডাকাত নয়," বাবু নিমকি মুখে দিয়ে বলল, "সিংহিবাবুকে ঘায়েল করতে গিয়েছিল। হয়তো খুন।"

শিশির মাথা হেলাল। "কোনো সন্দেহ নেই। ভবতোষ এখন যেমন করেই হোক সিংহিমশাইকে সরাতে চায়। আমার তাই মনে হচ্ছে।"

বংশী চায়ে চুমুক দিল। "খবরটা হেমবাবুকে দেওয়া দরকার।"

"আবার থানা-পুলিশ? সিংহিবাবু চটে যাবেন।"

"বোকা হলে চটবেন, বুদ্ধিমান হলে চটবেন না," বংশী বলল, "ওঁর জীবন কি শস্তা? ভদ্রলোককে মারবার চেষ্টা করা হচ্ছে এ-কথা তিনি থানায় জানাবেন না?"

কথার মধ্যে ছেদ পড়ল। জনা-দুয়েক খদ্দের এসেছে। একজনের আবার লম্বা ফিরিস্তি।

বংশী খদ্দেরকে মালপত্র দিতে লাগল। শিশির আর বাবু চা-নিমকি খাচ্ছিল।

খানিকটা সময় গেল বংশীর খদ্দের বিদায় করতে। ততক্ষণে তার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে।

শিশিরই আবার কথা তুলল। "থানায় বললে লাভ হবে কিছু?"

"সিংহিবাবুর বাড়ির ওপর নজর রাখবে।"

"সে-রকম নজর হেমবাবু কি রাখছেন না?"

"না," মাথা নাড়ল বংশী। "খোঁজ-খবর করা আর নজর রাখা এক কথা নয় শিশির। হেমবাবুকে আজই সব বলা দরকার। উনি স্টেশনের দিকে গিয়েছেন— এখুনি ফিরবেন। এখান থেকেই আমরা দেখতে পাব। তোমরা ওঁর সঙ্গে থানায় যাও। সব কথা বলো।"

বাবু এবার একটা সিগারেট ধরাল। "হিতে বিপরীত হবে না তো?"

"আমার মনে হয় না।"

শিশির বলল, "একটা কথা তুমি ভেবে দেখছ না, বংশী। সিংহিবাবুর কথা তুললেই আরও দশটা কথা উঠবে। তখন 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। হাজার হোক, সিংহিবাবুর তো দোষ আছে। তিনি ভবতোষের হয়ে আমাকে অসুস্থ করে তুলেছিলেন। কাজেই আমার মনে হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে কথা না বলে থানায় গেলে তাঁর বিপদও হতে পারে। তা ছাড়া বাবার কাছ থেকে চিঠির জবাব না পাওয়া পর্যন্ত হুট করে আমি কিছু করতে চাইছি না।"

বংশী চুপ করে গেল। ভাবছিল। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে বাবুর কাছে একটা সিগারেট চাইল। "দিন তো বাবুদা, বুদ্ধির ঘরে ধোঁয়া লাগিয়ে নিই।"

বাবু সিগারেট দিল। দেশলাইও সঙ্গে দিল।

বংশী সিগারেট ধরিয়ে টান মারল জোরে-জোরে। কাসল বার কয়েক। তারপর বলল, "সিংহিবাবুর লাইফের ওপর অ্যাটেম্প্‌ট একবার যখন শুরু হয়েছে, আবার হবে। তাঁকে এই বিপদের হাত থেকে কে বাঁচাবে? ভদ্দরলোক নিজে কি পারবেন? তিনি তো গুণ্ডা নন।"

শিশির একটু হাসল, মুচকি হাসি। "তুমি তো ওঁকে দু চোখে দেখতে পারতে না, বিশ্বাস

করতে চাওনি! এখন তোমার মত পালটে গেল?"

"না," মাথা নাড়ল বংশী, "পুরোপুরি পাল্টায়নি। খানিকটা পালটেছে। সিংহিবাবুকে আমি এখনও ষোলো-আনা বিশ্বাস করতে পারছি না, শিশির।"

"পারছ না?"

"না। কেন পারছি না বলতে পারব না। যে-লোক অন্যের কাছে টাকা খেয়ে তোমায় আজে-বাজে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে তোলার চেষ্টা করেন সেই মানুষটি মোটেই ভাল নন। তিনিও শয়তান। রাতারাতি তিনি ধর্মপুত্র হয়ে গেলেন— আর ভবতোষ একা শয়তান হল, এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন।"

বাবু আর শিশির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"তা হলে?" শিশির বলল।

"জানি না। ভবতোষ আর সিংহিবাবু— কে কী মতলব আঁটছেন বলা মুশকিল। কে কাকে মুঠোয় করার খেলা খেলছে বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, সিংহিবাবুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভবতোষ যদি তাঁকে খুন করার জন্য লোক লাগিয়ে থাকেন— আমাদের কাজ হবে খুনে গুণ্ডার হাত থেকে ভদ্রলোককে বাঁচানো। পুলিশের কাছে গেলে এটা সহজ হত। যদি পুলিশের কাছে না যেতে চাও, আমি অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি।"

"কী?"

"আমার হাতে **লছুয়া** বলে একটা লোক আছে। সে হল কাঠুরে। জঙ্গলে গাছ কাটত। এখনও ডাক পড়লে গাছ কাটতে যায়। পানবিড়ির দোকান দিয়ে বসে আছে ফটকের কাছে। তাকে কুড়ুল হাতে দেখলে তুমি ভিরমি খাবে। আমার বাবা ওকে এক রকম মানুষ করেছিলেন বাচ্চা বয়েসে। **লছুয়া** আমায় খুব ভালবাসে। দাদা বলে ডাকে। বেটা আমায় ধমক-ধামকও মারে। **লছুয়াকে** আমি সিংহিবাবুর বডিগার্ড করে রাখতে পারি। সিংহিবাবুর ক্ষতি হলে আমাদের ক্ষতি। ভবতোষের বিরুদ্ধে সে সবচেয়ে বড় প্রমাণ, বুঝলে?"

শিশিরের বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না। বলল, "বুঝেছি।"

(ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

আর এটা হ'ল মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উপায়...

ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাঁটি ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি এমন তরল ও পাতলা যে কয়েক ফোঁটা মাথায় ছড়ালেই সরাসরি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ করে সারা মাথার চামড়ার পুষ্টিসাধন করবে।

ফলস্বরূপ: স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া...যা হ'ল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন চুলের মূল আধার।

আরও কি, ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার আপনার চুলকে রাখে চিকন ও পরিপাটি—সর্বদাই।

ভেসলীন®

হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার

প্রতিটি ফোঁটাই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

HTM-PIL-2639-2

এবার নিন! প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্যে অফুরান শক্তির রসদ

বূস্ট

মল্ট চকোলেট মিল্ক ড্রিঙ্ক

একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের যেমন, আপনারও তাই—দিনটাকে ঠিকমতো শুরু করতে দরকার অফুরন্ত শক্তি। তাই রোজ সকালে আপনার চাই বূস্ট।

এই শক্তির রসদ আপনাকে সারাদিন তরতাজা, আর চূড়ান্ত গতিমান করে রাখে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের, দৌড়ঝাঁপে যাদের শক্তি ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশী।

ওদের বূস্ট খেতে দিন। বূস্ট, মল্ট, কোকো আর দুধ থেকে তৈরী। পুষ্টির ব্যাপারে যারা সবথেকে ভাল বোঝেন সেই বিখ্যাত হরলিক্স নির্মাতাদেরই তৈরী-বূস্ট!

ঘন সুস্বাদু বূস্ট বেশী শক্তি যোগাতে অতুলনীয়, কারণ তা তৈরী হয় পুষ্টিকর ক্রীমযুক্ত দুধ, গম, মল্ট বার্লি আর কোকো থেকে।

আপনার ছেলেমেয়েকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে বূস্টে রয়েছে অধিক সংখ্যক পুষ্টিকর উপাদান।

আর তা'ছাড়া বূস্টের স্বাদ! সারা পরিবারের জিভে-জল-আসা ঘন মল্ট চকোলেটের মজা! বূস্ট।

দিন শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রতিদিন।

Boost 'হরলিক্স' নির্মাতাদের তৈরী

৫০০ গ্রাম-এর সাশ্রয়কারী রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। এইটি কিনে ১ টাকা বাঁচান।

HTD-HMM-6820

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

(৪১)

যাত্রার কয়েকদিন আগে রাঙাকাকাবাবু আমাকে বললেন, সন্ধ্যায় গাড়ি চালিয়ে ইলাকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে নিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ নেই। তবে বুঝলাম, একটা বিরাট দুঃসাহসিক অভিযানের পূর্বে তাঁর নিজের প্রস্তুতির সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে। রাঙাকাকাবাবুর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ঈশ্বর ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে প্রমাণ করেছিলেন যে, সেই বিশ্বাসই সত্য, যা মানুষকে অফুরন্ত শক্তি দেয়, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে, নিরহঙ্কার ও নিঃস্বার্থ করে। কুসংস্কার বা অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ধর্মবিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক ও সামাজিক সব রকম প্রশ্নেও রাঙাকাকাবাবু ছিলেন উদার ও প্রগতিবাদী। সেজন্য, অন্ধ বা লোক-দেখানো ভক্তি, কুসংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানের আতিশয্য, যা বসুবাড়ির অনেকের মধ্যেই দেখেছি, রাঙাকাকাবাবুর মধ্যে দেখিনি। অবশ্য বিশেষ কোনো-কোনো অবস্থায় রাঙাকাকাবাবুকে অন্যদের সঙ্গে কিছু-কিছু আচার-অনুষ্ঠান মানতে দেখেছি। দুটি কারণে তিনি এটা করতেন। প্রথমত, পারিবারিক ব্যাপারে অযথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করা। দ্বিতীয়ত, যে কথাটা তাঁর নিজের মুখে শুনেছি, নিজের বিশ্বাস যাই হোক না কেন, অন্যের বিশ্বাসে অযথা আঘাত না করা।

যাই হোক, জ্যোৎস্নায় ভরা এক সুন্দর সন্ধ্যায় আমি ওয়াণ্ডারার গাড়িতে করে ইলাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলাম। আমি মন্দিরের সিঁড়িতে অপেক্ষা করলাম, ইলা ছোট একটি তামার পাত্র নিয়ে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিছু ফুল ও পাত্রটি নিয়ে ফিরে এল। রাঙাকাকাবাবু তাকে কী করতে বলেছিলেন—জিজ্ঞেস করলাম না।

এই সূত্রে দুটি কথা মনে পড়ে গেল। প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি অনশন আরম্ভ করেন কালীপুজোর দিন। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুর থেকে আমি তাঁর এক গোপন বার্তা পাই। তাঁর নিজের হাতে লেখা বার্তাটির ওপরে লেখা ছিল "শ্রীশ্রী কালীপূজা, ২৯শে অক্টোবর ১৯৪৩"। দেশের দশের কাজে আরাধ্য দেবীর কাছে নীরবে ও নিভৃতে আত্মনিবেদনের নিশ্চয়ই খুব গভীর তাৎপর্য আছে। এর ব্যাখ্যা করবার যোগ্যতা আমার নেই। এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার যুগে আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় যাতে কোনো বাধা না পড়ে সেজন্য নানা দিক দিয়ে আটঘাট বেঁধে নিতে হল। আত্মীয়-স্বজনদের কার কীরকম অভ্যাস সে তো জানাই আছে। মোটামুটি বড়রা সকলেই সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েন বা তিনতলায় নিজের-নিজের ঘরে চলে যান। চাকর-বাকরদের ঘুম বেশ গাঢ় লক্ষ করা গেল। বাড়ির প্রধান কাঠের সিঁড়ির একতলার দরজা রাঙাকাকাবাবুর বেয়ারা রমণী বন্ধ করে শোয়। যথাসময়ে দরজা বন্ধ করে তাকে শুতে যেতে বললেই হবে। রাঙাকাকাবাবু আগে থেকেই ঠিক করেছিলেন রান্নাবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে বেরোবেন। ঐ সিঁড়ির নীচের তলায় কোনো দরজাই নেই। বাড়ির সামনের গেটে তালা পড়ে না, ঠিক সময়ে খুলে নিলেই হবে।

নতুনকাকাবাবু ডাঃ সুনীলচন্দ্রের তেজী অ্যালসেশিয়ান কুকুর 'সানি বয়' সমস্যায় ফেলল। রাত্রে লোকের আনাগোনা দেখলে নির্ঘাত ঝাঁপিয়ে পড়বে। একদিন বেশি রাতে সত্যবাবু, সত্যরঞ্জন বক্সী, রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে

কথা বলে বাড়ি ফিরছেন, 'সানি বয়' তো ওই ছোট্ট মানুষটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই ঘটনার সুযোগ নিয়ে রাঙাকাকাবাবু ইলাকে নতুনকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বললেন। তাঁকে বলা হল, যে ক'দিন রাঙাকাকাবাবু জেলের বাইরে আছেন, অনেকেই তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এবং বেশি রাতে বাড়ি ফিরবেন। 'সানি বয়'কে যদি সন্ধ্যার পর দিনকতক বেঁধে রাখা যায় তো ভাল হয়। নতুনকাকাবাবু রাজি হয়ে গেলেন।

একদিন গিয়ে দেখি রাঙাকাকাবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, যেন ভাল কোনো খবর দেবেন। বললেন, আগের দিন রাত্রে তাঁর পুরো ছদ্মবেশ পরে ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে দেখেছেন, খুব ভাল হয়েছে, কেউ চিনতে পারবে না। আমি সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, "ওই চেহারা ঢেকে রাখা খুবই শক্ত, যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুন না কেন।" আমার মন্তব্য তাঁর পছন্দ হল বলে মনে হল না।

শেষের দিকটায় আমি একটু ঘন ঘন— এ বেলা ওবেলা এলগিন রোডের বাড়িতে যেতে লাগলাম, যদি কোনো খবর থাকে! ১৪ জানুয়ারি দুপুরে আমাকে রাঙাকাকাবাবু জানালেন, সিগন্যাল এসে গেছে, ১৬ জানুয়ারি রাত্রে যাত্রা করতে হবে। মনে মনে আমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দৌড়ে গাড়িটা সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা করতে গেলাম। ষোলো তারিখের আগে বুকিং পেলাম না। তবে গ্যারাজ থেকে আশ্বাস দিল, কাজ সম্পূর্ণ করে সন্ধ্যার আগে গাড়ি ফেরত দেবে।

শেষের দিকে রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, হোল্ড্-অল্টা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে, শেষ মুহূর্তে জিনিসপত্র নিতে সুবিধা হবে। আবার একবার কাপড়-জামা বাছাবাছি করার অজুহাতে অন্য কাপড়-জামার সঙ্গে চাদরে মুড়ে হোল্ড্-অল্টা রাঙাকাকাবাবুর কাছে রমণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি ঘর বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর বাক্স গোছাতে লাগলাম। স্যুটকেসটা গোছাবার সময় হঠাৎ একটা খটকা লাগল। ওয়াণ্ডারার গাড়ির মাল রাখবার জায়গাটায় জিনিস ঢোকাতে হত গাড়ির ভেতর থেকে, সীটের পেছনটা নামিয়ে। ফাঁকটা খুব বড় ছিল না। আমার সন্দেহ হল, স্যুটকেসটা ঢুকবে তো! ফিতে দিয়ে স্যুটকেসের উচ্চতা মেপে লোকের চোখ এড়িয়ে গ্যারাজে গিয়ে ফাঁকটা মাপলাম। বুঝলাম, স্যুটকেসটা ঢুকবে না। কখন আবার একটা স্যুটকেস কিনব, নাম লেখাব? রাঙাকাকাবাবুই বা কী মনে করবেন? আমার ঘরের পাশের বারান্দায় বাড়ির সব বাক্স-প্যাঁটরা জমা করা থাকত। সেখান থেকে S. C. B. মার্কা ঠিক মাপের বাবার একটা স্যুটকেস বের করলাম। বাক্সবদল করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। দৌড়ে এক বোতল চাইনিজ্ ইঙ্ক, স্পিরিট ইত্যাদি যোগাড় করলাম। বাবার স্যুটকেসের ডালার উপর থেকে S. C. B. অক্ষরগুলো অনেক কষ্টে ঘসে তুলে ফেললাম, আর যতটা পারি বড় অক্ষরে M. Z. লিখলাম। যে স্যুটকেসটা রাঙাকাকাবাবুর জন্য কিনেছিলাম, একই ভাবে তার ওপর থেকে M. Z. তুলে S. C. B. লিখে অন্যান্য স্যুটকেসের সঙ্গে রেখে দিলাম। রাঙাকাকাবাবুর জন্য যে-সব জিনিসপত্র কিনেছিলাম স্যুটকেসে ও অ্যাটাচিকেসে গোছালাম। দু কপি কোরান অ্যাটাচিকেসে নেবার জন্য দিয়েছিলেন। ইলা দু-রকম কবিরাজি ওষুধ ছোট শিশিতে ভরে লেবেল দিয়ে নিজের হাতে নাম লিখে পাঠিয়েছিল। লেবেলগুলো তুলে ফেললাম।

দেখতে-দেখতে দুটো রাত কেটে গেল। ১৬ জানুয়ারি এসে পড়ল। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। কলেজে একবার চেহারাটা দেখানো ভাল হবে মনে করে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে এলাম। অদ্ভুত রকমের মনের ভাব হয়েছিল আমার। দেখছি সকলেই যার-যার নিত্যনৈমিত্তিক ও গতানুগতিক কাজ করে যাচ্ছে। আমি মনে মনে যেন অন্য জগতে বাস করছি। মনে হল, যেন ওই গতানুগতিক জীবনযাত্রা পেছনে ফেলে আমি অনেক দিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। কলেজে একটা লেকচারও শুনলাম, কিন্তু মাথায় ঢুকল না কিছুই। সেই সময় অ্যানাটমি শিখবার জন্য মৃতদেহ কাটাকাটির কাজে নিযুক্ত ছিলাম। দুজন-দুজন করে ছাত্রকে এক সঙ্গে শরীরের এক-একটা ভাগ ডিসেক্শন্ করতে দেওয়া

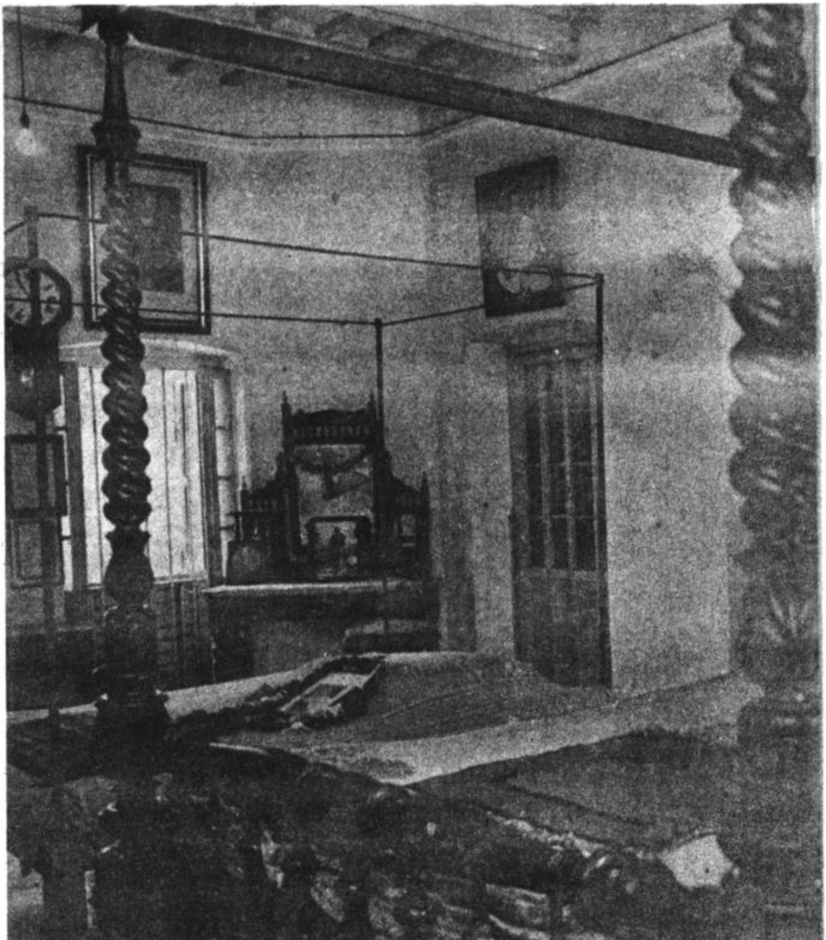

রাঙাকাকাবাবুর সেই শোবার ঘর

হত। আমার পার্টনার প্রভাতকুমার বসু ছিল খুবই সরল প্রাণখোলা লোক, যা বলব তাই; মেনে নেবে। আমাদের ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন ডাক্তার সুবোধ সুররায়। শিক্ষক হিসাবে যেমন তাঁর নাম, চারদিকে তেমনই তাঁর চোখ। তাঁর কাছ থেকে ছুটি নিলাম না। প্রভাতকে কেবল বলে এলাম, বাড়িতে একটু কাজ পড়ে গেছে, দিন দুয়েক নাও আসতে পারি।

বিকেলের দিকে রাঙাকাকাবাবুর ঘরে উঁকি মারলাম। অন্য লোক ছিল, কথাবার্তা বিশেষ হল না। পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম। দুজনেই যেন বলতে চাইলাম, সব ঠিক আছে। আমাকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, রাত ন'টার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে হাজির হতে, যত শীঘ্র সম্ভব রওনা হয়ে যেতে চান।

(ক্রমশ)

বুঝে নাও

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যা পাবে সবটা তার হবে ঘরে ঢোকাতেই—
এমন কী কথা আছে? পুরো চায় বোকাতেই।
পণ্ডিতে অর্ধেক ত্যাগ করে জিতে যায়;
গোবরের 'বর'টুকু কনে শুধু নিতে চায়।
খিচুনির চেয়ে 'চুনি' দামি—সেটা জানো তো?
বিছুটির চেয়ে 'ছুটি' উপাদেয়—মানো তো?
প্রহারের চেয়ে 'হার', তাড়নার চেয়ে 'তাড়'—
বালাইয়ের চেয়ে 'বালা' কাজে লাগে গহনার—
তাগাদার চেয়ে 'তাগা'। ফুল তোলে শচীনাথ,
আগুনের ফুলকিতে দেয় না সে কচি হাত।

'হাল' পেতে চায় মাঝি নাজেহাল না হয়ে,
ভেজালের 'জাল' পেলে জেলে খুশি তা লয়ে।
ছোবলের 'বল' নিতে দানবের নিতে 'দান',
দামামার 'মামা' নিতে সুবোধেরা সদা ধান।
হিমশিম হতে 'শিম', ডিণ্ডিম হতে 'ডিম',
থাবড়ারে ছেঁটে 'বড়া', নিমখুন হতে 'নিম',
আমবাত হতে 'আম', হরতাল হতে 'তাল',
হয়রানি হতে 'রানি' খানদানি চিরকাল।
কৃকলাস হতে 'কলা', লোপাটের চেয়ে 'পাট',
গজালের চেয়ে 'গজা', মলাটের চেয়ে 'লাট',—
হাতকড়ি হতে 'কড়ি' পায় কিছু বেশি মান—
জরিমানা হতে 'জরি', শ্লোগান-এর চেয়ে 'গান'।
মশালের চেয়ে 'শাল'-এ শোভে ভাল ঘাড়টা
নরকের চেয়ে 'রক'-এ জমে ভাল আড্ডা।

তাই বলে বলছি না পুরো সবই মন্দ
লোকে করে 'হাজা' হতে হাজারই পছন্দ।
'কাগ' হতে 'কাগজি' জনপ্রিয় জানি তা।
'বড়ি' হতে 'রাবড়ি' যে সুস্বাদু মানি তা।
বালিশের চেয়ে 'বালি' ভাল বলা যায় না।
'গালিচা' সবারি প্রিয়, 'গালি' কেউ চায় না।
'কোকিল' পুরোই ভাল, 'কিল' নয় সুবিধার
'চাকুরে' 'চাকু'র চেয়ে প্রিয় (থাক খুবই ধার)।
'গোলা' হতে 'গোলাপ'-এরে গুণী দেয় মান্য
'মোড়' হতে 'মোড়ল'-এর অধিক প্রাধান্য।
'নিম' হতে নিমকি, 'কচু' হতে কচুরি
উপাদেয়—সাক্ষী তো আছে তার প্রচুরই।
অতএব সবই যার যেমন পছন্দ
রাখবে বা ছেঁটে নেবে বুঝে ভাল মন্দ।

ছবি দেবাশিস দেব

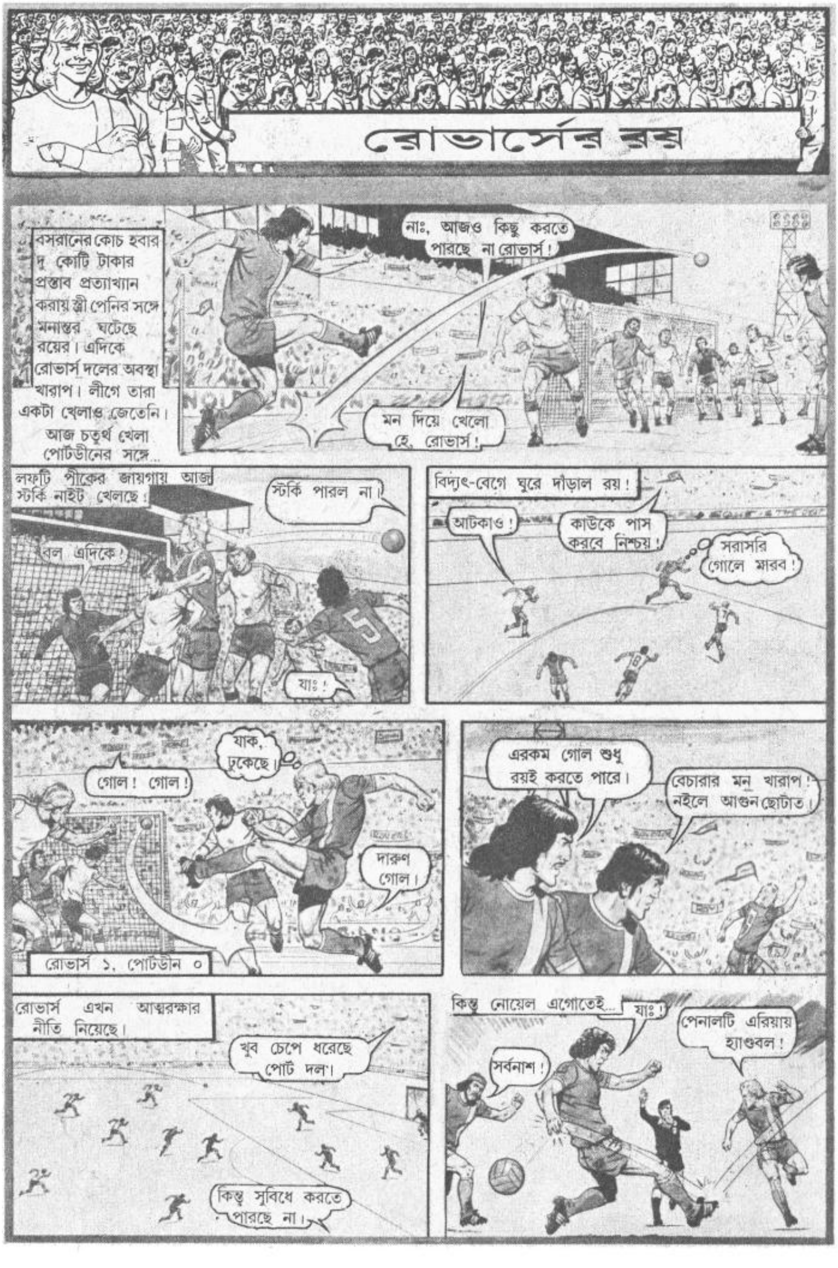
রোভার্সের রয়
বসরানের কোচ হবার দু কোটি টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় স্ত্রী পেনির সঙ্গে মনান্তর ঘটেছে রয়ের। এদিকে রোভার্স দলের অবস্থা খারাপ। লীগে তারা একটা খেলাও জেতেনি। আজ চতুর্থ খেলা পোর্টডীনের সঙ্গে...
নাঃ, আজও কিছু করতে পারছে না রোভার্স!
মন দিয়ে খেলো হে, রোভার্স!
লফটি পীকের জায়গায় আজ স্টর্কি নাইট খেলছে।
স্টর্কি পারল না।
বল এদিকে!
যাঃ!
বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরে দাঁড়াল রয়!
আটকাও!
কাউকে পাস করবে নিশ্চয়!
সরাসরি গোলে মারব!
যাক, ঢুকেছে।
গোল! গোল!
দারুণ গোল।
রোভার্স ১, পোর্টডীন ০
এরকম গোল শুধু রয়ই করতে পারে।
বেচারার মন খারাপ! নইলে আগুন ছোটাত।
রোভার্স এখন আত্মরক্ষার নীতি নিয়েছে।
খুব চেপে ধরেছে পোর্ট দল।
কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না।
কিন্তু নোয়েল এগোতেই...
যাঃ!
পেনালটি এরিয়ায় হ্যাণ্ডবল!
সর্বনাশ!

গোল করতে ভুলচুক হল না!
গোল শোধ!
হায় রোভার্স।
তিনটেয় হেরে একটায় ড্র!
সবাই আমাদের ছিড়ে খাবে!
রাত্রে...টিভি-ভাষ্যে...
মেলচেস্টার রোভার্স এখন লীগ-টেবিলের একেবারে তলায়...
GATESFIELD 2 2 0 4
EASTGATE 1 2 1 3
NORTH VALE 1 2 1 3
MELCHESTER 0 3 1 1
W L D P
সমর্থকরা খেপে যাবে!
পেনি বসরান থেকে ফিরেছে। এয়ারপোর্টে...
বাচ্চা দুটো দিব্যি ছিল।
আর তুমি?
ফিরে এসে আমার খুব ভাল লাগছে।
টেলিফোনে তাহলে অত মেজাজ দেখাচ্ছিলে কেন?
বসরানে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছে আমার নেই!
বাড়ি ফেরার পথে...
সিদ্ধান্ত তাহলে আমিই নেব তো!
নিশ্চয়। যে-সিদ্ধান্তই করো, আমি মেনে নেব।
বাড়ির সামনে...
আরে, ঝকঝকে এই দামি গাড়িটা কার?
তাই তো।
আমি তো নতুন গাড়ি কিনিনি। তাহলে?
গাড়িটা কেউ উপহার হিসেবে পাঠাল?
দামি গাড়ির লোভ কারা দেখাচ্ছে?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

চুপ করো! শিগগির চুপ করো!
না!
অ্যাঁ! অ্যাঁ! অ্যাঁ!
লোকটাকে বেঁধে রাখা দরকার...কিন্তু...
অ্যাঁ! অ্যাঁ!
কি
ক্লিক
অ্যাঁ! অ্যাঁ!
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
তুমি আমায় মেরেছ! বাবাকে দিয়ে তোমাকে মার খাওয়াব।
খাইও.....
যাচ্চলে! জ্ঞান হয়ে লোকটা পালিয়েছে!
?
বাবা তোমাকে ধরে চাবকাবে!
বটে!
মুরাদ, তুমি দাউদ আর আবদুলকে খবর দাও। দাউদকে নিয়ে ওদিক থেকে খোঁজো। আবদুলকে আমার কাছে পাঠাও। ঠিক ধরব ওদের।
ঠিক আছে।
...তখন কী হল জানো? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেই জমিদার তো দরজা খুলে দিল। তারপরেই সে হতভম্ব!
দাউদ! আবদুল! এক্ষুনি এসো।
গপ্পে-গপ্পে অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখন তাহলে যাই। আমার ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হলে তাকে পাঠিয়ে দিও, কেমন?
এবারে ওদের ধরব।
বাবা তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে!
বাছাধনরা পালাবে কোথায়!
টিনটিনের অদৃষ্টে কী আছে কে জানে!
আরে, কুট্টুসকে তো বাড়িতে রেখে এসেছিলুম!
পথ চিনে-চিনে এখানে এল কী করে!
কুট্টুস! এই যে কুট্টুস।

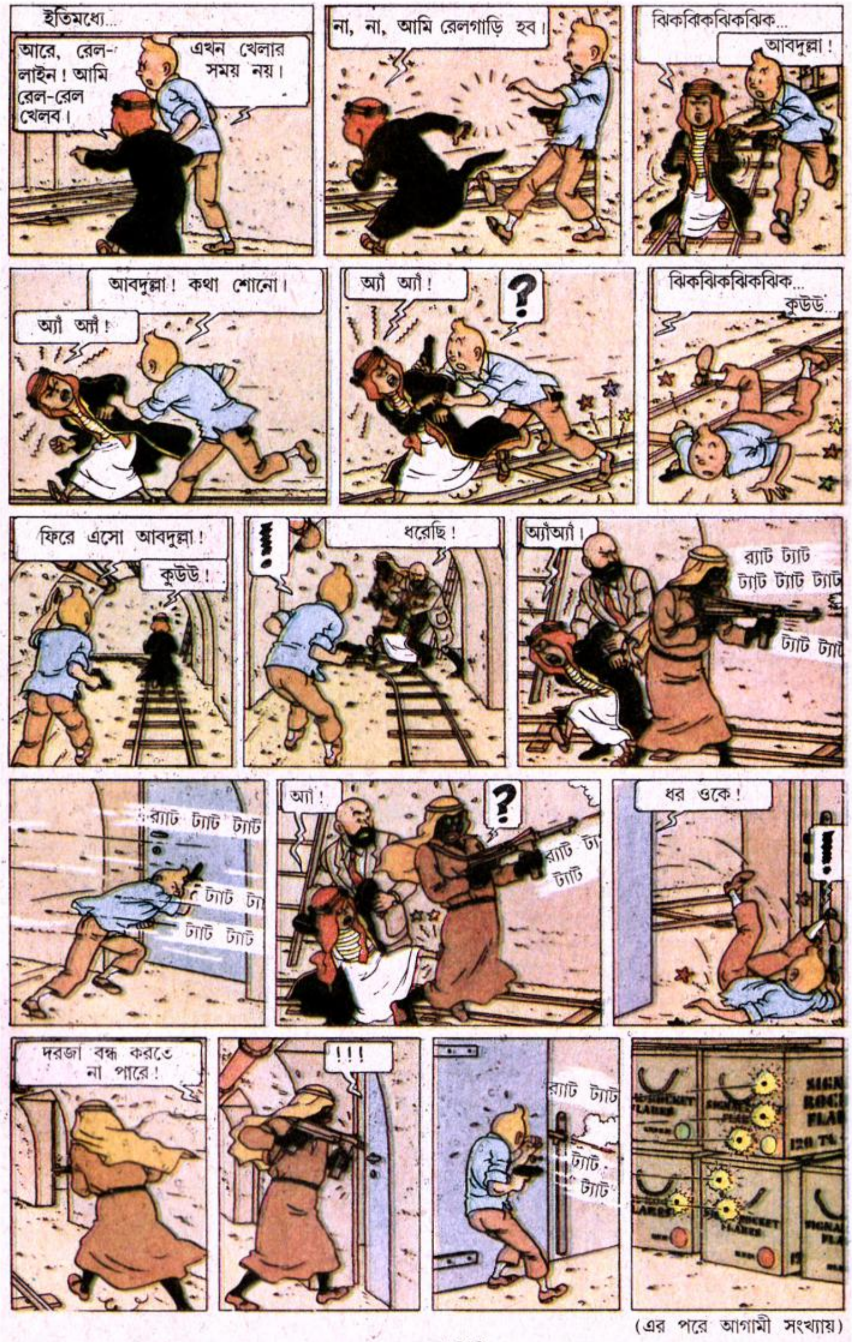

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

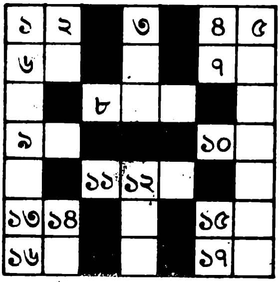

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দড়ি। (৪) শিশুর চলাফেরা। (৬) সংস্কৃতে গুহা, বাংলায় জলাভূমি। (৭) দৈত্য। (৮) ভারতীয় বিমান-বন্দর। (৯) যে সাজে সে-ই হাসায়। (১০) জীবনধারণের বাতাস। (১১) জাদুবিদ্যা। (১৩) এক মহাপুরুষ এতে বিদ্ধ হয়েছিলেন। (১৫) খালবিল শুকিয়ে গেলেও গাছের আগায় জল ধরে রাখে কে? (১৬) জলজ উদ্ভিদবিশেষ। (১৭) গয়না হলে আনন্দ, খেলায় হলে নয়।

উপর-নীচ : (১) বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী। (২) আকাশ থেকে পড়ে। (৩) আফ্রিকার অরণ্যবাসী। (৪) তীর্থবিশেষে না গেলে হওয়া যায় না। (৫) বিখ্যাত হ্রদ। (১২) শিকল। (১৪) পরামর্শ। (১৫) মিথ্যার জোরদার বিশেষণ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

মে	ধা		ক	বি	রা	জ
হে			লা	ভা		ম্বু
দি	ত্তি			ব		ক
	ল	ব	ণা	সু	র	
ম		র			কি	স্তি
ন্দু		রু	পা			মি
[illegible]	ং	চি	তা		দূ	ত

ধাঁধা

ব্যাপারটা ধাঁধার মতোই ঘটে গেল।

ছোটকা সেদিন অফিস থেকে ফোন করেছে। আমিই ধরেছিলাম ফোনটা। তখন প্রায় একটা সোয়া-একটা হবে। ছোটকা আমায় বলল, "ওপরের ঘরে গিয়ে আলমারির মাথা থেকে চাবিটা নিবি, তারপর আলমারি খুলে দ্বিতীয় তাকে শার্টের তলায় দেখবি একটা খাম রয়েছে, খামের ওপরে দেখবি ইংরেজিতে লেখা আছে—ভেতরে কত টাকা রয়েছে, আমি ফোনটা ধরে আছি, তুই চট করে দেখে এসে আমায় বল, কত টাকা রয়েছে, এরপর বলছি, কী করতে হবে।"

আমি ফোনটা ছেড়ে একদৌড়ে ওপরে গেলাম। চাবি পেলাম আলমারির মাথায়, আলমারি খুললাম, দ্বিতীয় তাকে খামটা দেখলাম, খামের ওপরে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে '98'। খামটা রেখে, আলমারি বন্ধ করে নীচে এলাম। ফোনটা ধরে ছোট্কাকে জানালাম—"আটানব্বই টাকা রয়েছে ছোটকা।"

"আটানব্বই?" ফোনের ওপার থেকে ছোটকার গলা ভেসে এল, "ফাইন। তুই কী করবি শোন। খামটা থেকে আশি টাকা নিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ মৃণাল স্টোর্সে দিয়ে আসবি, আর দশটা টাকা তুই নিয়ে নিবি, আর বাকি টাকাটা খামেই রেখে দিবি।"

"আমি কী করব দশ টাকা নিয়ে?" ছোটকাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"তোর খাটুনির পুরস্কার। যা খুশি তাই করবি।" ছোটকার চটপট জবাব ভেসে এল ফোনে।

আমি তো দারুণ উত্তেজিত। দশ-দশটা টাকা এই সামান্য কাজের জন্য। ছোটকার তুলনা নেই।

কিন্তু বিকেলবেলা খামটা খুলে প্রথমে আশি টাকা গুনে আলাদা করলাম। দশ টাকা, পাঁচ টাকা, দু-টাকা, এক-টাকার নোট। যা হোক, আশি টাকা তো হল। কিন্তু এ কী কাণ্ড, আমার দশ টাকা নেবার মতো টাকা কই! বাকি যা রয়েছে, তাতে ছোটকার প্রাপ্য টাকাই বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন।

দুবার-তিনবার গুনলাম। না, গোনায় ভুল নেই। ছোড়দিকে ডেকে আনলাম। ছোড়দিও গুনল। টাকার হেরফের হল না। ছোড়দি তখন বলল, "খামটা দেখি।"

ছোড়দিকে খামটা দেখালাম। ছোড়দি একপলক দেখেই হো-হো করে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতেই আমাকে বলল, "ছোটকা তোকে দারুণ বোকা বানিয়েছে। কোথাও গোলমাল নেই। তুই নিজেই গোলমাল পাকিয়েছিস। যা, আগে মৃণাল স্টোর্সের টাকাটা দিয়ে আয়।"

মৃণাল স্টোর্সে আশি টাকা দিয়ে এলাম। ফিরে আসার পর, ছোড়দি আমায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। গোলমালটা আমিই করেছি। কী গোলমাল করেছি, অনুমান করতে পারো? হ্যাঁ, এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শেষ কোন্ ইংরেজি সাল এমন গিয়েছে যে-সালকে পুরো উলটো করে নিলেও একই থাকে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ 'চটাহৈঁনাড়া' — ঠিকমতো সাজালে কী হয়?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, এবং ৩৭। (২) ২৪ এবং ৬। (৩) নৃমুণ্ডমালিনী।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টেলিফোনের মাউথপীসের ফোটো

ফোটো: তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কখনোই আপনার টেলিফোন পাই না, কী করা যায় বলুন তো?

উঃ আমার টেলিফোন পাওয়া তো খুব সহজ। ড্রইংরুমে ঢুকেই ডান দিকে ছোট টেবিলটার ওপর রাখা আছে দেখতে পাবেন।

প্রঃ কোন্ জিনিস আপনি চান অথচ পেয়ে গেলে জানতেও পারেন না?

উঃ ঘুম।

প্রঃ আপনার গোরুকে এই ওষুধটা দু-চামচ করে দিনে তিনবার খেতে দেবেন, মনে থাকবে তো?

উঃ মনে তো থাকবে, কিন্তু আমার গোরুটা তো কখনো চামচে করে খেতে শেখেনি।

সুসেন

মজার খেলা

ক্যারামের চারটে কালো আর চারটে সাদা ঘুঁটি, এই হল এবারের খেলার উপকরণ। ঘুঁটি আটটাকে নীচের ছবির মতন সাজাও টেবিলে—

○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

খেলাটা হল, পাশাপাশি যে-কোনও দুটো ঘুঁটি তুলে নিয়ে সে-দুটোকে অন্য ফাঁকা জায়গায় বসানো যাবে, তবে যে-ভাবে ছিল সেইভাবেই থাকবে, কালো-সাদার স্থানপরিবর্তন চলবে না। এইভাবে চার চালে এমন ভাবে ঘুঁটিগুলোকে সাজাতে হবে যাতে চারটে কালো চলে আসে পাশাপাশি, চারটে সাদাও বসে পাশাপাশি।

বন্ধুদের খেলতে দাও। দেখবে, কীভাবে নাস্তানাবুদ হয় তারা। তবে তোমার নিজের জন্যে চিন্তা নেই। শিখিয়ে দিচ্ছি, কীভাবে চার দানে ব্যাপারটা চটপট হয়ে যায়। ছবি দেখে-দেখে অভ্যেস করো।

○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

প্রথম দানে সরছে ৬ ও ৭—

● ○ ○ ● ○ ● ○ ●
৬ ৭ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৮

দ্বিতীয় দানে, ৩ ও ৪—

● ○ ○ ● ○ ○ ● ●
৬ ৭ ১ ২ ৫ ৩ ৪ ৮

তৃতীয় দানে ৭ ও ১ সরছে—

● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
৬ ২ ৭ ১ ৫ ৩ ৪ ৮

শেষ দানে ৪ ও ৮ সরে আসছে—

● ● ● ● ○ ○ ○ ○
৬ ৪ ৮ ২ ৭ ১ ৫ ৩

মজারু

হাসিখুশি

রামায়ণের গল্প বলতে বলতে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "বিভীষণের নাম শুনেছ তোমরা?"

সবাই নিরুত্তর। বুকুন উঠে দাঁড়াল, "খুব শুনেছি স্যার, মস্ত বড় রাজমিস্ত্রি ছিল বিভীষণ। এ-তল্লাটের সব কটা বাড়িই তো বিভীষণ বানিয়েছে।"

●

এক লাখ টাকা উপার্জন করার সবচেয়ে সোজা উপায় হল কর্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম, সততা, ভাল ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে লটারিতে এক লাখ টাকা জেতা।

●

একটি বহুতল বাড়ির একতলায় লেখা রয়েছে, 'অভিযোগ বিভাগ, সতেরো তলায়। লিফট খারাপ, দয়া করে পায়ে হেঁটে উঠবেন।'

বুকুন রোজই ঘুরপথে বেশ দেরিতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে দেখে বাবা একদিন গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বুকুন? রোজ এত দেরি করে বাড়ি ফিরছ যে!"

বুকুন বলল, "জানো বাবা, ও-পাড়ার হারুদা বলেছে, যেদিন তাদের মিষ্টির দোকানের শতবর্ষ হবে সেদিন সবাইকে পেটপুরে রাজভোগ খাওয়াবে। এখন দোকানের বয়েস নব্বুই।"

"তাতে কী হয়েছে?" বাবা ধমকে উঠলেন।

"না, মানে," বুকুন আমতা-আমতা করে বলল, "কোনোদিন হঠাৎ হয়তো একশো হয়ে যাবে, আমি টেরও পাব না। তাই রোজই ঐ পথ দিয়ে ঘুরে আসি।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

মাছ ধরা

জীবন ভৌমিক

সুজয়ের মতো যাদের বয়স, তারা সাধারণত ফুটবল, ক্রিকেট বা হুশ্‌হুশ্‌ এইসব খেলে স্কুল-ফেরত বিকেল কাটায়। সুজয়ের ওসব খেলার ঝোঁক নেই। সব রকম খেলার খবর-টবর রাখে বটে, তবে নিজে খেলে দাবা। আরেক দাবাড়ু তো ঘরেই রয়েছেন। তিনি সুজয়ের দাদু। নাতিকে নিজেই দাবা শিখিয়েছেন। সুজয়ের মায়ের প্রথমে আপত্তি ছিল। 'ও মা, সে কী কথা। ঐটুকু ছেলের মাথায় দাবার নেশা ধরাবেন।' সুজয়ের বাবা তাতে বলেছিলেন, "দাবার চর্চা মানে বুদ্ধির চর্চা। মগজ পাকে। লেখাপড়ায় সাহায্য হয়।" তা সত্যি বলতে কী, সুজয়ের মা অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন গত বার্ষিক পরীক্ষায় সুজয়ের রেজাল্ট দেখে। যে-ছেলে অঙ্কে কোনওদিন পাঁচের কোঠার ওপরে নম্বর তুলতে পারেনি, সে এবার অঙ্কে পেয়েছে পঁচাশি।

তা দাবার নেশা বলতে যা বোঝায়, সেটা তো আর সুজয়ের নেই। সেটা আছে দাদুর। সুজয়ের দাদুর অবশ্য আরেকটি নেশা আছে। সেটা হল মাছ-ধরা। শীতকালটায় সুজয়ের দাদু প্রায়ই দুপুর বেলায় মাছধরার সাজসরঞ্জাম বগলে নিয়ে লিলুয়া বা ঘোষপাড়ার ঝিলে চলে যান মাছ ধরতে। ঐসব জলে ছিপ ফেলতে হলে টিকিট কাটতে হয়। পাঁচ টাকার টিকিট কেটে কেউ হয়তো পাঁচ মিনিটেই পাঁচ কিলো ওজনের রুই কাতলা গেঁথে ফেলে। আবার দিনের পর দিন টিকিট কেটেও কারও বঁড়শির

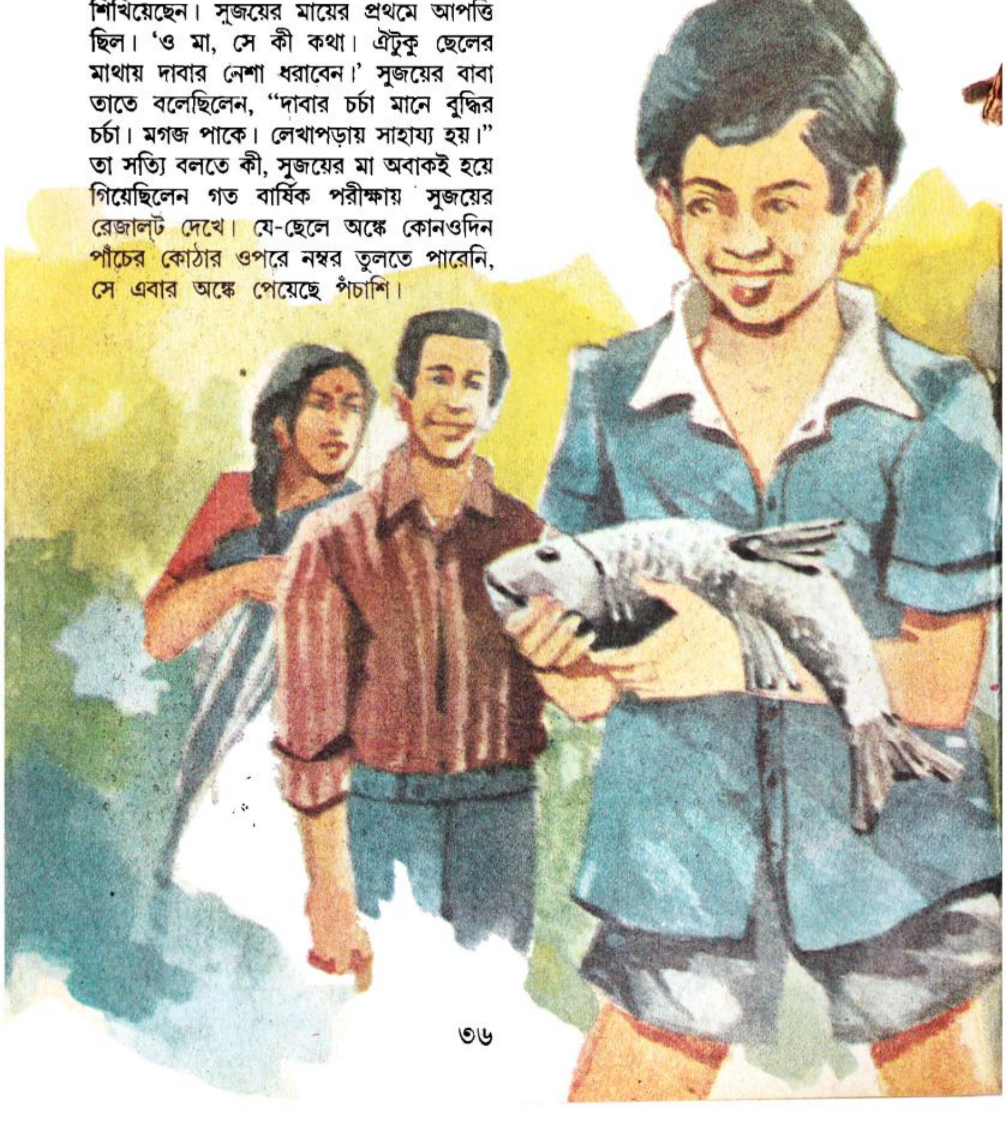

টোপে হয়তো মাছের মুখ লাগে না। সুজয়ের দাদু হলেন শেষোক্ত দলের। সবই নাকি কপাল।

মাছ ধরতে গেলে সুজয়ের দাদু যখন বাড়ি থেকে বেরোন, সুজয় তখন স্কুলে। যখন ফেরেন, তখন সন্ধে। সুজয় তখন স্কুলের পড়া করছে। মনটা থাকে দাদুর দিকে। কখন তিনি ফিরবেন। মনে আশা থাকে, হয়তো দাদু আজ একটা মস্ত মাছ হাতে নিয়ে সুজয়কে ডাকবেন 'দাদুভাই দেখবে এসো।' কিন্তু না, আজ পর্যন্ত দাদু একটা মাছও ধরতে পারেননি। এর জন্য সুজয়ের মা-বাবা দাদুকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করেন। দাদুও হাসেন। হাসলে কী হবে। দাদুর মনের কোণে জমে থাকা দুঃখটুকু সুজয় যেন দেখতে পায়। দাদুর ভাগ্যের জন্য সুজয়ের কষ্ট হয়। পুকুরের মাছগুলোর উপর রাগ হয় সুজয়ের। ইশ্, একটা যদি মন্ত্র জানা থাকত!

রবিবার বা স্কুল-ছুটির দিন দুপুরের টাস্ক শেষ হলে দাদু প্রায়ই সুজয়কে নিয়ে দাবাতে বসেন। আজকাল সুজয় এটা বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল ছুটির দিনে দাদুর সঙ্গে সুজয় মাছ ধরতে যায়। সুজয়ের মা-বাবা আপত্তি করেননি। বলেছিলেন, "দ্যাখো, তোমার ভাগ্যে যদি তোমার দাদুর কপাল খোলে।"

সুজয়ের জন্যও একটা ছোট ছিপ কেনা হয়েছে। দাদুর ছিপখানা রেঙ্গুন বাঁশের। তাতে জাপানি নাইলনের লাইন। এসব ছিপের এখন অনেক দাম। টোপের জন্য পিপড়ের ডিম, পাউরুটি, মাখন, একটু মধু, এসব নিয়ে যাওয়া হয়। চার দেবার জন্য কোনওদিন মেথি-পান্তাভাতের কাই নেওয়া হয়।

একদিন প্রায় তিন কিলো ওজনের একটা কাতলা মাছ হাতে সুজয় তার দাদুর সঙ্গে বাড়ি ফিরল। সুজয়ের মা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আনন্দের চোটে সুজয়ের বাবাকে চিৎকার করে ডাকলেন, "ওগো দেখে যাও, ওরা মাছ ধরেছে।"

রাত্রিবেলায় খাবার টেবিলে বসে মাছ শিকারের গল্প শোনার জন্য সুজয়ের মা যতবার সুজয়কে উশকে দেন, ততবারই সুজয় বলে, "এ আর এমন কী! দাদুকে বলতে বলো না!"

সুজয়ের দাদু একসময় মাছের মুড়োতে কামড় বসিয়ে বলেন, "ওঃ, মাছটা যা ভুগিয়েছে না, কী বলব!"

সুজয়ের বাবা বলেন, "থাক, আপনাকে বলতে হবে না। আপনি ভাল করে খান তো!"

ঠিক তার পরের রোববার ওদের হাতে আরেকটা মাছ। এটা একটু ছোট। দেড় কিলো দু কিলো ওজন হবে। বাইরে থেকে সুজয়

ছবির মজা

ওয়াই-মার্কা ঘর হলুদ আর বি-মার্কা ঘর নীল-রঙের পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করে দ্যাখো ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

চেচাঁচ্ছে, "মা, ও মা!" সুজয়ের দাদু চেঁচাচ্ছেন, "বৌমা, বৌমা!" যেন বোমা হাতে ডাকাত পড়েছে বাড়িতে। সুজয়ের বাবা তখন সবেমাত্র আড্ডা থেকে ফিরে গায়ের জামা খুলছেন। ওদের চিৎকারে চমকে এবং কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে সুজয়ের মা-বাবা দৌড়ে বারান্দায় এসে দেখেন, দাদুর সঙ্গে সুজয় লাফাতে-লাফাতে বাড়িতে ঢুকছে। হাতে ধরা একটা মাছ। দুজনের সে কী আনন্দ।

সুজয়ের মা সুজয়ের দাদুকে বললেন, "ওমা, আজ আপনারা এরকম করছেন কেন! কাল আপনাদের কী হয়েছিল। কাল তো আপনাদের তেমন আনন্দ দেখিনি। অথচ কাল তো এর চেয়ে বড় মাছ ছিল। তা ছাড়া, সেটা আপনার প্রথম মাছ।"

সুজয়ের মা যতক্ষণ ধরে এই কথাগুলো বললেন, ততক্ষণ ধরে সুজয় তো ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল। রকমসকম দেখে সুজয়ের বাবা যখন ডাক্তার ডাকবার কথা চিন্তা করছেন, ঠিক তখন, দাদু কিছু বলবার আগেই, সুজয় লাফাতে-লাফাতে তার মাকে বলল, "আগের দিনের কথা ছেড়ে দাও। ওটা বাজার থেকে কেনা মাছ ছিল। আর এটা হল সত্যিকারের ধরা মাছ।"

সুজয়ের মা-বাবার চোখ দাদুর দিকে ঘুরে গেল। দুজন একসঙ্গে বলে উঠলেন, "সে কী?"

সুজয়ের মুখ ফস্‌কে কথাটা যে কখন বেরিয়ে গেছে, তা সে বুঝতেই পারেনি।

ধরা পড়ে গিয়ে সুজয়ের দাদু বললেন, "আসলে বুদ্ধিটা দাদুভাই-ই আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, একদিন অন্তত একটা মাছ বাড়িতে নিয়ে যেতে না পারলে নাকি আমার প্রেস্টিজ থাকছে না। আগের দিনের মাছটা আমাদের রঘুপতির কাছ থেকে কিনেই এনেছিলাম। কী করে আর জানব বলো যে, সত্যি-সত্যি আজ মাছ ধরা পড়বে।"

সুজয়ের মা সুজয়কে বললেন, "প্রেস্টিজ রাখতে গিয়ে দাদুকে আর কোনওদিন এমন বুদ্ধি দিও না, বুঝলে।"

দু'হাতে মাছটাকে ফেডারেশন কাপের মতো ওপর দিকে তুলে সুজয় বলল, "ঠিক আছে।"

ছবি অনুপ রায়

পিঠে পড়ে কিল

চোখ পিট্-পিট্
বুক ঢিপ্-ঢিপ্
মাথা টন্-টন্
পায়ে ঝন্-ঝন্
হাতে ধরে খিল
পিঠে পড়ে কিল

মধুমিতা ঘোষদস্তিদার (বয়স ১৫)

বোকা বানালাম

আমি বলি, "জানিস ভুতো
রাতে এনেছি নতুন জুতো।"
জুতো দেখতে ছুটল ভুতো,
কিন্তু কোথাও জুতো নেই তো!
তখন আমি চেঁচিয়ে বলি,
"বোকা বানালাম, এবার চলি।"

পার্থসারথি বসু (বয়স ১২)

রাজার ছেলে

এক যে ছিল রাজা
রোজ খেত সে ভাজা
রাজার ছিল ছেলে
সে খেলত গোলে
রাজা গেল যেই মারা
ছেলে হল সর্বহারা

নন্দিতা সরকার (বয়স ৬)

হাঁসের মা

ডিমের উপর হাঁসের মা
তাইরে-নাইরে দিচ্ছে তা
ডিম ফুটল বাচ্চা হল
প্যাঁক-প্যাঁক ডাক দিল

অর্পিতা পালিত (বয়স ৭)

মাছ ধরতে গিয়ে

আন্দোলন মণ্ডল (বয়স ১৩)

মাছ ধরতে আমার খুব ভাল লাগে। আমার এক বন্ধুর নাম কল্লোল। তাদের একটা বেশ বড় পুকুর আছে। এবার আমাদের স্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষার পরে সে আর আমি ঠিক করলাম, ওই পুকুরে একদিন মাছ ধরব। সঙ্গে সঙ্গে যোগাড়-যন্তর শুরু করে দিলাম।

আমাদের বাড়িতে একটা ছিপ ছিল। অন্য একজন বন্ধুর কাছ থেকে আর একটা ছিপ যোগাড় করলাম। গোবর দিয়ে তৈরি করলাম মাছের চার। বঁড়শিতে গাঁথবার জন্যে বোলতার চাক ভেঙে সংগ্রহ করলাম বোলতার ডিম। এইভাবে সব যোগাড় করে আমরা একদিন সকালে পুকুরের ধারে গিয়ে একটা ভাল জায়গা দেখে বসলাম।

প্রথমেই আমরা মাছের চার পুকুরে ভাল করে ছড়িয়ে দিলাম। তারপরে দুজনে বঁড়শিতে বোলতার ডিম গেঁথে ছিপ ফেললাম। ধীরে-ধীরে সময় কাটতে লাগল। কারও ছিপেই মাছ উঠল না। বেলা যত বাড়ছে আমাদের খিদেও তত বাড়ছে। টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ শেষ হল। মাছের দেখা নেই। ফাতনাটা নড়েও না চড়েও না।

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে গেল। বিকেল হল। মাছের হদিস নেই। মাছের আশা ছেড়ে আমরা যখন উঠব ভাবছি তখন কল্লোলের ছিপের ফাতনাটা নড়ে উঠে জলের তলায় ডুবে গেল। তাই দেখে কল্লোল এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে ও নিজেই উলটে পড়ল জলের মধ্যে।

জল থেকে ওঠার পরে দেখা গেল, ওর বঁড়শিতে ছোট্ট একটা পুঁটিমাছ গেঁথে আছে। মাছটাকে জলে ছেড়ে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

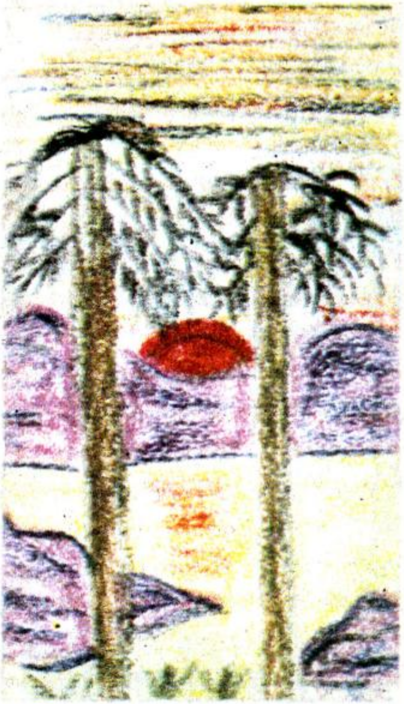

ছবি : ঈশিতা কর বয়স ১১

মতিলাল নন্দী

মতিলাল নন্দী—
এঁটেছেন ফন্দি,
নিজে ছাড়া সকলকে
করবেন বন্দী।
এইবেলা তাই
বলে রাখি ভাই,
ভুলেও কোরো না যেন
তাঁর সাথে সন্ধি।

অর্ণব মিত্র বয়স ৯

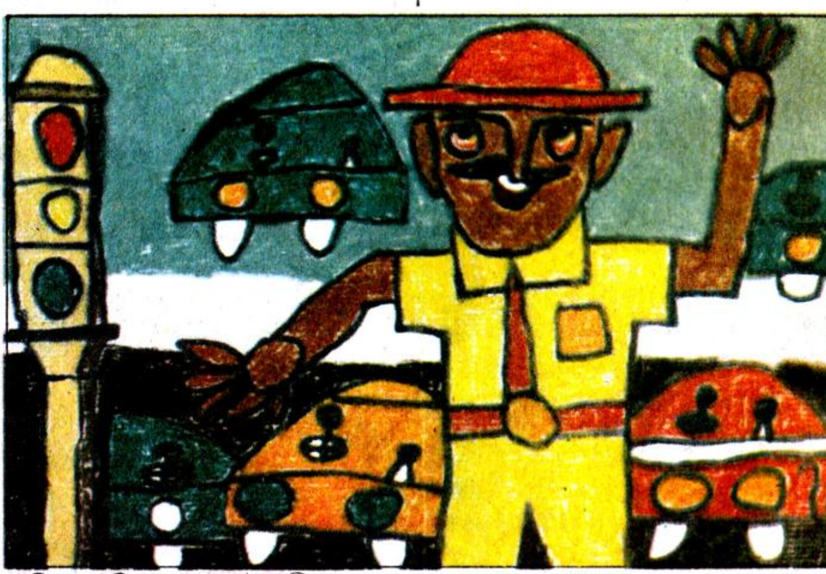

ছবি : মৃত্তিকা দত্তচৌধুরী বয়স ৬

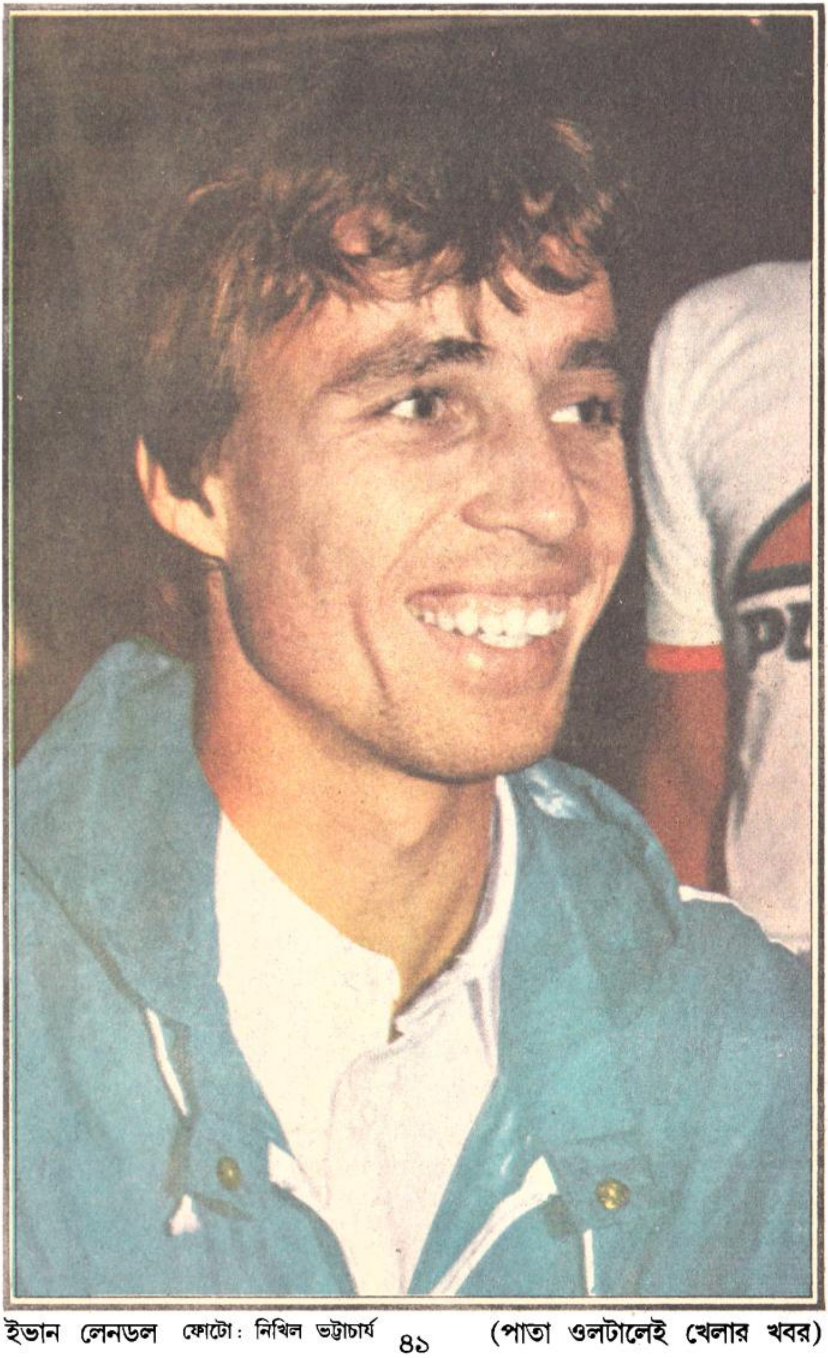

ইভান লেনডল ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই খেলার খবর)

JUMBO CIRCUS
অনেক নোতুন খেলা নিয়ে আমরা আবার কোলকাতা আসছি তোমাদের জন্যে
বাঘ হাতি সিংহ ক্লাউন ট্র্যাপিজ আরো অনেক কিছু
জাম্বো সার্কাস
JUMBO

কলকাতায় সেরা টেনিস

অরিজিৎ সেন

বহুকাল পরে কলকাতায় একটি বড় টেনিসের আসর বসল। গত সাত-আট বছরের মধ্যে এত নামী-দামি খেলোয়াড় ভারতে আসেননি। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, "ক্লাসিক টেনিস টুর্নামেন্ট" দেখতে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রীতিমত ভিড় হবে। কিন্তু টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম এবং ভারতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় অমৃতরাজ গরহাজির হওয়ায় সে আশা পূর্ণ হল না।

তবুও তোমরা যারা স্টেডিয়ামে অথবা টেলিভিশনে নভেম্বরের ৩ ও ৪ তারিখের খেলা দেখেছ, তারা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে, বিশ্বের আগামী দিনের "শ্রেষ্ঠ" খেলোয়াড়কে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার একুশ বছর বয়সী দুর্ধর্ষ টেনিস-খেলোয়াড় ইভান লেনড্‌ল্ শুধু যে এই টুর্নামেন্ট জিতেছেন—তা নয়, তাঁর অপূর্ব খেলা সত্যিই মনে রাখার মতো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দু'জন টেনিস-খেলোয়াড়—এক নম্বর জন ম্যাকেনরো এবং দু-নম্বর বিয়র্ন বর্গকে যে অল্প কজন হারিয়েছেন, ভাগ্যবান লেনড্‌ল্ তাঁদেরই একজন।

প্রথমে স্থির হয়েছিল, ক্লাসিক টেনিস টুর্নামেন্টে লেনড্‌ল্‌সহ বিজয় অমৃতরাজ, ভিটাস জেরুলাইটিস এবং ওয়াজটেক ফিবাক অংশ নেবেন। কিন্তু অমৃতরাজ ও জেরুলাইটিস অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের জায়গায় আসেন এলিয়ট টেলট্‌স্‌চার আর জন আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডারের বয়স এখন ৩০, কলকাতায় ও মাদরাজে আগেই খেলে গিয়েছেন। টেলট্‌স্‌চার অবশ্য এই প্রথম ভারতে এলেন। ২১ বছর বয়সী এই সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় এখন বিশ্ব-টেনিসে ৯ নম্বর। অনেকে মনে করেন, টেলট্‌স্‌চারও হয়তো ভবিষ্যতে লেনডলের মতোই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবেন।

প্রথম দিনের খেলা বেশ কিছু দর্শককে হতাশ করে। ফিবাক লড়লেন লেনডলের

জন আলেকজাণ্ডার

সঙ্গে। কিন্তু বেশিক্ষণ যুঝতে না পেরে ৪-৬, ৩-৬-এ হেরে যান।

ওদিকে ঐদিন দুপুরে পৌঁছেই ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা আলেকজাণ্ডার টেলট্‌স্‌চারকে প্রায় দাঁড় করিয়ে রেখে ৬-২, ৬-৪-এ খেলা জেতেন। আলেকজাণ্ডারের নেটের খেলা এত ভাল হবে ভাবা যায়নি।

টেলট্‌স্‌চার যে এই টুর্নামেন্টকে সত্যিই তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তা বোঝা গেল দ্বিতীয় দিনে—যখন দেখা গেল তিনি অন্য খেলার বিজেতা ফিবাকের সঙ্গে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রথম সেটে সুন্দর খেলে টেলট্‌স্‌চার ৬-১-এ জেতেন। তখন তাঁর খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ম্যাচ জিতে যাবেন। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে পরপর কয়েকটি ভুল করে যখন ৬-৬এ টাইব্রেকারে পৌঁছোন, তখন থেকেই দেখা গেল তাঁর আর খেলায় মন নেই। ফিবাক দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেট ৭-৬, ৬-২ গেমে জেতেন।

ফাইনাল খেলা অবশ্য খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। লেনড্‌ল্ ৬-৪, ৬-২ গেমে ম্যাচ জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের কয়েকটি অসাধারণ মারও ভোলার নয়। দুজনেই দারুণ অ্যাটাকিং খেলা খেলেছেন। আর তার ফলে প্রায় প্রতিটি পয়েন্টই দর্শকদের হাততালি কুড়িয়েছে।

সত্যি বলতে কী, এই ধরনের টেনিসের আসর কলকাতায় অনেকদিন দেখা যায়নি।

পূর্বাঞ্চলের দুর্ভাগ্য

রাজু মুখোপাধ্যায়

এ-বছরের মতন দলীপ ট্রফির পালা শেষ। পশ্চিমাঞ্চল দল এই নিয়ে ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হল। পূর্বাঞ্চল এখনও একবারও ট্রফি জিততে পারেনি। তার ভাগ্যে এবারও জুটেছে দ্বিতীয় স্থান। দলীপ ট্রফি শুরু হয় ১৯৬১—৬২ সালে—সেই থেকে এবার নিয়ে তিনবার পূর্বাঞ্চল ফাইনালে পৌঁছল, পর পর দু-বছর।

কটকে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে পূর্বাঞ্চল দারুণ খেলে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে। ফাইনালে বোম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের মাঠে প্রথম দিন ব্যাট করতে নেমে প্রণব রায় (৯০) আর অরুণলাল (১০৯) যে দায়িত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। ওঁদের জুটিতে রান উঠেছিল ১৯০। দ্বিতীয় জুটির ক্ষেত্রে এটি পূর্বাঞ্চলের রেকর্ড।

কিন্তু পরের ব্যাটসম্যানেরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেতে পারেননি। দিনের শেষে রান সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ২৩৭। পরের দিন শেষের দিকের ব্যাটসম্যানেরা অবশ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে দলের মোট রান নিয়ে যান ৩২৭-এ।

পশ্চিমাঞ্চলের বেংসরকার ফোটো: জয়ন্ত শেঠ

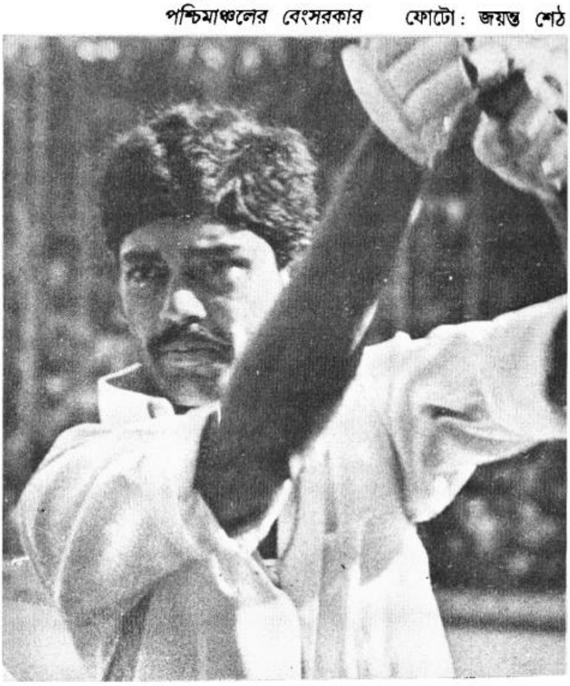

পশ্চিমাঞ্চলের বোলিংও আশানুরূপ হয়নি। কারসন ঘাউড়ির মতো টেস্ট খেলোয়াড়ও বলের নিশানা নির্ভুল রাখতে পারেননি। ধীরাজ পারসানা ও অশোক মাঁকড়ের বোলিংয়েও তেমন ধার ছিল না। বোম্বাই রঞ্জি দলের ডান-হাতি মিডিয়াম পেস বোলার সাঁধু চমৎকার জায়গা রেখে বল করেছিলেন, সময় সময় দুদিকে সুইং করিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন তারকা বোম্বাইয়ের ১৯ বছরের বাঁ-হাতি স্পিন বোলার রবি শাস্ত্রী খেলেছিলেন মনে রাখার মতো খেলা, তিনি ১০৩ রানে ৪টি উইকেট দখল করে নেন।

পশ্চিমাঞ্চল দল ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই বিপদ বাড়িয়ে তোলে। বিহারের রণধীর সিং পশ্চিমাঞ্চলের নামীদামি ব্যাটধারীদের ধরাশায়ী করে ফেলেন। অপর প্রান্ত থেকে বাংলার সুব্রত পোড়েল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে যান। দ্বিতীয় দিন খেলার শেষে পশ্চিমাঞ্চলের রান দাঁড়ায় ১১৮। যে চারজনকে প্যাভিলিয়ানে ফিরে যেতে হয়, তাঁরা হলেন বিখ্যাত অংশুমান গায়কোয়াড়, সুনীল গাভাসকার, সন্দীপ পাতিল ও গুলাম পারকার। পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক ও ভারতের অন্যমত সেরা স্পিন বোলার দিলীপ দোশি শেষের তিনজনের উইকেট দখল করে পশ্চিমাঞ্চলকে রীতিমত সংকটে ফেলে দেন। শ্লিপে দাঁড়িয়ে অরুণলাল দুটি চমৎকার ক্যাচ নিয়ে যোগ্যতার পরিচয় দেন।

পরের দিন রণধীর সিং প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে খেলতে শুরু করেন। তাঁর বলের নিশানা আর গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে জুলফিকার পারকার ও অশোক মাঁকড় বিদায় নেন। এই সময় পশ্চিমাঞ্চলের দখলে ছিল ১৩০ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট। কিন্তু খেলার ধারা পালটে যায়। দিলীপ বেংসরকারের কমপক্ষে ছটি ক্যাচ ফেলে দেন পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়েরা। রবি শাস্ত্রীও একটি 'জীবন' পান। এরকম দুর্বল ফিলডিংয়ে কখনও বড় ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়

দিলীপ দোশি ও রণধীর সিং আপ্রাণ চেষ্টা করেও ফীল্ডারদের ব্যর্থতার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের বেংসরকার-শাস্ত্রী জুটিকে সরাতে পারলেন না। দুজনেই করলেন শতরান। তবে বেংসরকার যখন বিদায় নিলেন, তখনও পূর্বাঞ্চলের রান অতিক্রম করতে ১২ রান

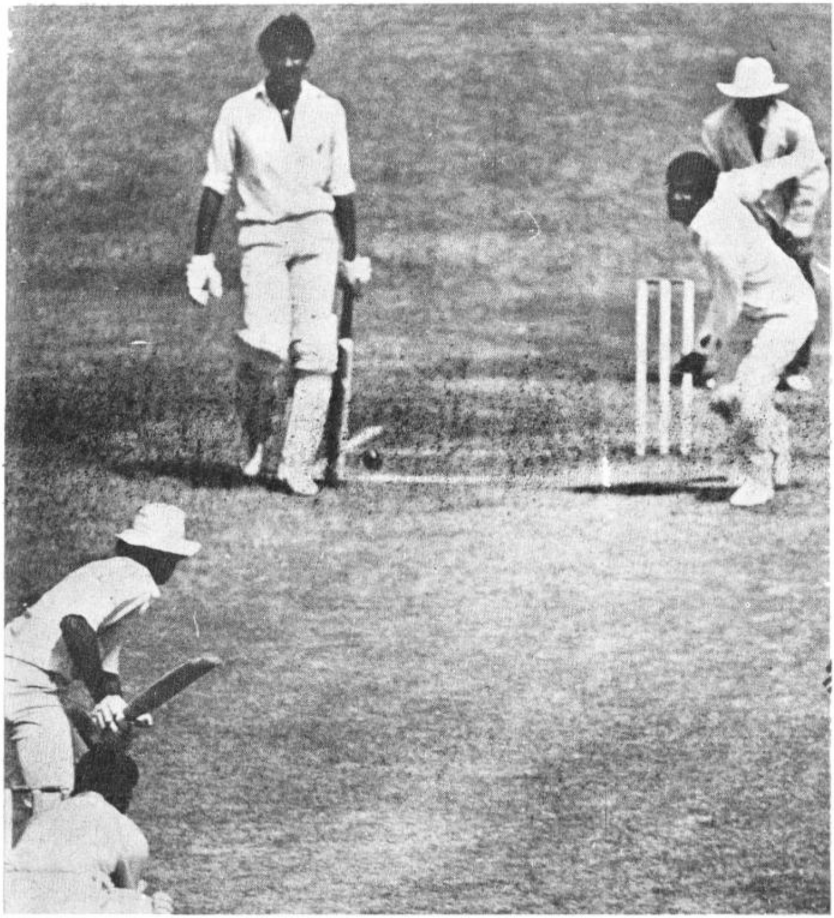

দলীপ ট্রফির ফাইনাল। দিলীপ দোশি বল করছেন ফোটো: নিখিল ভট্টাচার্য

বাকি। এই জুটিতে যোগ হল ১৭৯ রান। বেংসরকারের শতরান রবি শাস্ত্রীর সেঞ্চুরির তুলনায় নেহাতই সাধারণ। শাস্ত্রী যে ধৈর্য,, সংযম ও ব্যাটিং-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন, হয়তো তার ফলে ভবিষ্যতে তাঁর বোলিংয়ের চেয়ে ব্যাটিংয়ের কথাই বেশি শুনব।

পশ্চিমাঞ্চলের ইনিংস শেষ হল ৪৩১ রানে। দোশি (৪—১৩১) ও রণধীর (৪—১৪৭) উইকেট ভাগাভাগি করে নিলেন। দ্বিতীয় পর্বে পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিংয়ের মধ্যে আত্মনির্ভরতার ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র ১০০ রানে ৫ উইকেট হারায়। এর পর পূর্বাঞ্চল দিনের শেষে আর কোনো উইকেট না-হারিয়ে ১৩৮ রানে পৌঁছয়।

খেলা শেষ। এখন জল্পনা-কল্পনার সময়। সুব্রত পোড়েলকে দিয়ে মাত্র ১৯ ওভার বল করানোর অর্থ কিছুতেই মাথায় ঢুকল না। যে জয়প্রকাশ দক্ষিণাঞ্চলকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন আগের খেলায় তাঁকেও যে কেন এত অল্প সুযোগ দেওয়া হল, তাও পরিষ্কার হল না। রণধীর সিং, অরুণলাল ও প্রণব রায়ের সাফল্য পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়ারসিকদের খুশি করেছে ঠিকই, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়রা ক্যাচের পর ক্যাচ ফশকে শেষ পর্যন্ত যে-খেলা দেখালেন, তাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে যথেষ্ট। এই যদি তাঁদের ফীলডিংয়ের মান হয়, তাহলে আর ম্যাচ জিতবার আশা করা কেন?

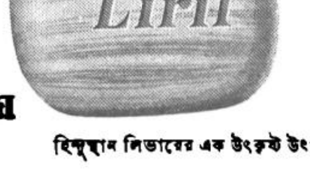

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ !

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিনটাস-LR.28-203 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

কিট্টু চলে গেলেন

সুব্রত সিংহ

কিট্টু আর নেই—এই খারাপ খবরটা আমার মতো অনেককেই চমকে দিয়েছিল। সে কী! এই তো সেদিন ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে কুয়ালালামপুরে ঘুরে এলেন তিনি। অবশ্য, ওখানেই তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে, তিনি যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন—কেউই ভাবতে পারেনি। কিট্টু কুয়ালালামপুরে গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের টেক্‌নিকাল ডাইরেকটর হিসেবে। কিট্টুর অকাল-বিয়োগে ভারতীয় ফুটবলের যথেষ্ট ক্ষতি হল।

কিট্টুর পুরো নাম জগন্নাথন কৃষ্ণমূর্তি, কিন্তু ফুটবল জগতে তিনি কিট্টু নামেই পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের এই মানুষটি বাঙালিদের মন জয় করে ফেলেছিলেন। ১৯৫২ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডাকে, এবং ওই বছরই দেশে ফিরে যান। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ওই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ডাকে আবার আসেন, এবং দীর্ঘদিন ওই ক্লাবেই খেলেন। মাঝখানে অবশ্য একবছর, অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে, তিনি রাজস্থান ক্লাবে খেলেছিলেন। ১৯৫৪-য় ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন কিট্টু। ১৯৫৫ সালে চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভারতীয় দলের সঙ্গে তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন। তবে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় বছর ছিল ১৯৫৬ সালটি। ওই বছর মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হন। অধিনায়ক ছিলেন সমর ব্যানার্জি (বদ্রু)। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলায় বদ্রুর জায়গায় তিনি অধিনায়কত্ব করেছিলেন। ওই খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ৬২ মিনিট পর্যন্ত ভারত এক গোলে এগিয়ে ছিল, অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। ভারত হেরে গিয়েছিল ৪—১ গোলে।

১৯৫৫ সালে এর্নাকুলামে জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল। সে-বছর বাংলা দলের অধিনায়ক ছিলেন প্রখ্যাত ফুটবলার আমেদ খাঁ। কিন্তু ফাইনালে আমেদ খাঁর জায়গায় কিট্টুকে খেলানো হয় লেফট-ইনে। দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলার প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়ে তিনিই মুখ্য ভূমিকা নেন। ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে রাশিয়া সফরও করেছিলেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতে-খেলতেই কিট্টু ১৯৫৯-৬০ সালে সাময়িকভাবে কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন খেলোয়াড়দের অনুরোধে। এই নতুন ভূমিকা হয়তো তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল রাজকুমারী অমৃত কাউর স্কীমে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব নিতে। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি পাতিয়ালায় এন আই এস কোচ ছিলেন। বাঙ্গালোরে এন আই এস-এর শাখা খোলা হলে তিনি সেখানে ফুটবলের প্রধান হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই পদেই বহাল ছিলেন তিনি। এ-ছাড়া প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে পশ্চিম জার্মানিতেও পাঠানো হয়েছিল।

কিট্টু মারডেকায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিলেন। হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন। ছাড়া পেয়ে ডাক্তারদের নিষেধ উপেক্ষা করে প্রতিদিন মাঠে প্রশিক্ষণের সময় উপস্থিত থাকতেন। ব্রাজিলের সাওপাওয়ালো দলের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলার আগের দিনেও তিনি ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণের সময় খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছিলেন নানা ভাবে। তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিলেন নিজের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যে। সৎ, দায়িত্বশীল এবং একজন প্রকৃত খেলোয়াড়ের মৃত্যুতে আমরা সকলেই বেদনাহত।

"বালো বালো, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

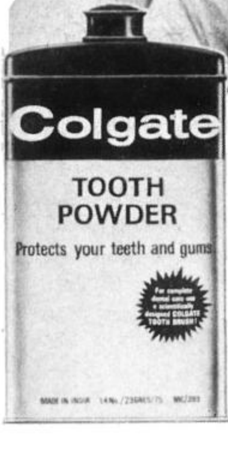

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝক্‌ঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেণ্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

প্রকাশের হ্যাটট্রিক

অশোক রায়

ব্যাডমিন্টন কোর্টের এক দিকে দাঁড়িয়ে এক ক্ষিপ্র, দুর্ধর্ষ চিনা খেলোয়াড় তখনও নিশ্বাস ফেলছিল, কিছুটা ক্লান্তিতে। আর কোর্টের অন্যদিকে এক ভারতীয় জাদুকর হাতের র‍্যাকেটের জাদুদণ্ড দিয়ে তাকে সম্মোহিত করছিল, কিছুটা স্বস্তিতেই। মোটামুটি এই রকম একটা ছবি দেখলেন ইণ্ডিয়ান মাসটার্স ওপেন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার শেষ দিনের ফাইনালে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ। ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোনের কাছে হার মানলেন চিনের এক নম্বর খেলোয়াড়—হ্যান্ জিয়ান।

রাউণ্ড রবিনে প্রথম ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের দু-নম্বর খেলোয়াড় রে স্টিভেনসন এবং দ্বিতীয় ম্যাচে সুইডেনের কিলস্ট্রমকে চূর্ণ করে প্রকাশ যখন এগোচ্ছিলেন ঠিক তখনই তৃতীয় ম্যাচে ডেনমার্কের নীয়েরহফ্ প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বড় অঘটনটি ঘটালেন প্রকাশকে হারিয়ে। প্রকাশ ফাইনালে উঠলেন, কিন্তু ওই পরাজয়টি তাঁকে প্রাথমিক অস্বস্তিতে রাখল ফাইনালে হ্যান্ জিয়ানের বিরুদ্ধে অন্তত প্রথম গেমে। তার ওপর ছিল স্বদেশের মানুষের আকাশ-ছোঁয়া প্রত্যাশা। চাপের ফাঁস আলগা করার আগেই ঝড়ের গতিতে আক্রমণ হেনে হ্যান্ জিয়ান প্রকাশের কাছ থেকে প্রথম গেমটি ছিনিয়ে নিলেন ৯-১৫ পয়েন্টে।

দ্বিতীয় গেমের শুরুতে সবচেয়ে জরুরি ছিল প্রকাশের নিজেকে ফিরে পাওয়া। তাঁর সুচতুর ড্রপশট, বুদ্ধিদীপ্ত প্লেসিং এবং ক্রসকোর্ট পাসিংয়ের ধারালো অস্ত্রগুলো ঠিক-মতো কাজ শুরু করতেই মাত্র চোদ্দ মিনিটে দ্বিতীয় গেমটি চলে এল প্রকাশের অনুকূলে ১৫-৫ পয়েন্টে।

ফর্মে ফিরতে দেখে মনে হয়েছিল তৃতীয় গেমের দখল নিতে প্রকাশের হয়তো তেমন খাটুনি হবে না। কিন্তু ভাবনাকে উলটে দিতে চাইলেন চিনের এক নম্বর সৈনিক—হ্যান্ জিয়ান। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রায় যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন অসাধারণ সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে। ১২-৪ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা প্রকাশকে দুর্দান্ত স্ম্যাশ এবং প্রচণ্ড র‍্যালিতে উৎকণ্ঠিত রেখে ফলাফল দাঁড় করালেন ১৪-১২ পয়েন্টে। অবশেষে বিচলিত দর্শকদের আশ্বস্ত করা ওভারহেড স্ম্যাশটি প্রকাশকে দেড় হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং প্রতিযোগিতার জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিল। এই নিয়ে পরপর তিনটি প্রতিযোগিতায় (লণ্ডন মাস্টার্স, ওয়াল্‌র্ড কাপ এবং ইণ্ডিয়ান মাস্টার্স) হ্যান্ জিয়ানকে হারিয়ে হ্যাট্-ট্রিক করলেন ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকা—প্রকাশ পাড়ুকোন।

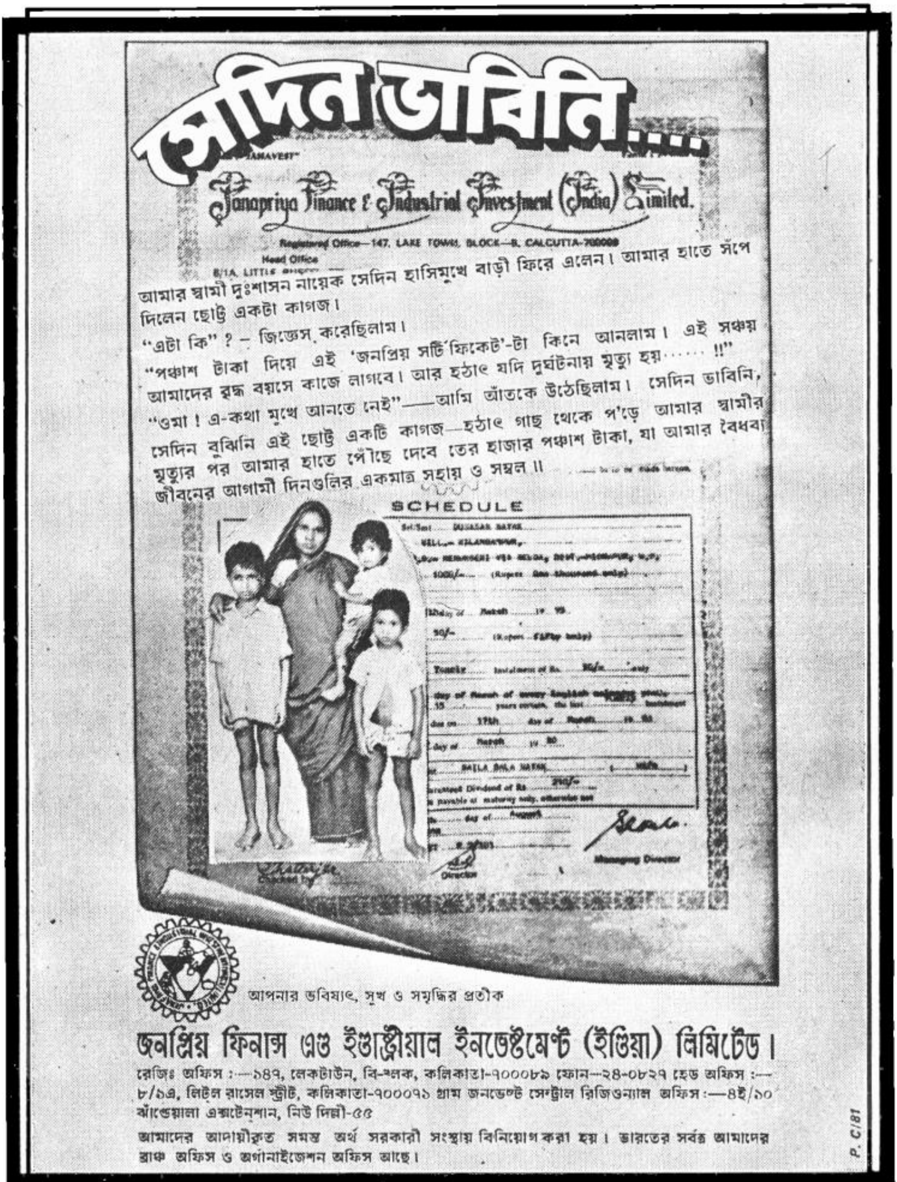
সেদিন ভাবিনি....
Janapriya Finance & Industrial Investment (India) Limited.
Registered Office—147, LAKE TOWN, BLOCK—B, CALCUTTA-700089
Head Office
আমার স্বামী দুঃশাসন নায়েক সেদিন হাসিমুখে বাড়ী ফিরে এলেন। আমার হাতে সঁপে দিলেন ছোট্ট একটা কাগজ।
"এটা কি" ? – জিজ্ঞেস করেছিলাম।
"পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এই 'জনপ্রিয় সার্টিফিকেট'-টা কিনে আনলাম। এই সঞ্চয় আমাদের বৃদ্ধ বয়সে কাজে লাগবে। আর হঠাৎ যদি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়...... !!"
"ওমা ! এ-কথা মুখে আনতে নেই"——আমি আঁতকে উঠেছিলাম। সেদিন ভাবিনি, সেদিন বুঝিনি এই ছোট্ট একটি কাগজ—হঠাৎ গাছ থেকে প'ড়ে আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার হাতে পৌঁছে দেবে তের হাজার পঞ্চাশ টাকা, যা আমার বৈধব্য জীবনের আগামী দিনগুলির একমাত্র সহায় ও সম্বল ॥
SCHEDULE
Managing Director
Director
আপনার ভবিষ্যৎ, সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক
জনপ্রিয় ফিনান্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড।
রেজিঃ অফিস :—১৪৭, লেকটাউন, বি-ব্লক, কলিকাতা-৭০০০৮৯ ফোন—২৪-০৮২৭ হেড অফিস :—৮/১এ, লিট্‌ল রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১ গ্রাম জনভেস্ট সেণ্ট্রাল রিজিওন্যাল অফিস :—৪ই/১০ ঝাঁণ্ডেয়ালা এক্সটেন্‌শান, নিউ দিল্লী-৫৫
আমাদের আদায়ীকৃত সমস্ত অর্থ সরকারী সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়। ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।
P. C/81

ইণ্ডিয়ান মাস্টার্সের পাশাপাশি ঠিক এই ধরনের যে ছবিটি অনেকেরই মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে, সন্দেহ না রেখেই বলা যায়, সেটা কুয়ালালামপুরে সদ্যসমাপ্ত ওয়ার্ল্ড কাপের। শুনতে আশ্চর্য মনে হবে যে, ওয়ার্ল্ড কাপের সারা টুর্নামেন্টে প্রকাশের কাছ থেকে একটি গেম ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারও হয়নি। দুর্ধর্ষ ফর্মে-থাকা প্রকাশ ফাইনালে হ্যান্ জিয়ানের বিরুদ্ধে খেলা শুরু করেছিলেন চোখ-ধাঁধানো মার দিয়ে।

প্রথম গেম ১৫-০ ব্যবধানে শেষ করতে সার্ভিস বদল হয়েছিল মাত্র চারবার। এবং গোটা ব্যাপারটির জন্যে প্রকাশকে ব্যয় করতে হয়েছিল মাত্র আট মিনিট সময়।

দ্বিতীয় গেমে হ্যান্ জিয়ান লড়াইয়ে ফিরে আসেন। যদিও শেষ পর্বে বার-তিনেক ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে সমর্থকদের উৎসাহ কুড়িয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। গেম হারেন ১৮-১৬ পয়েন্টে।

প্রকাশের খেলার সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত অংশটি হল—বিপক্ষের শক্তি বুঝে খেলার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা। প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক মেজাজের খেলোয়াড়কে কীভাবে ঢিমে-তালে খেলতে বাধ্য করতে হয় সেটা প্রকাশ তাঁর খেলায় দেখিয়েছেন। ক্ষিপ্র, তৎপর হ্যান্ জিয়ানের বিরুদ্ধে প্রকাশের প্রথম জয়কে যাঁরা 'অঘটন' বলেছিলেন, তাঁদের মতের পরিবর্তন এবার হয়তো হবে। এতদিনে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যাডমিন্টনে চিনারাও অপ্রতিরোধ্য নয়। এমন-কী, তিনি যদি হ্যান্ জিয়ান হন, তাও নয়।

বাপ্পার প্রথম ছড়া

কবিরুল ইসলাম

বাপ্পা যখন ছোট্ট ছিল
এক্কেবারে ছোট,
তখনও মুখে ফোটেনি তার রা
সুভাষ তুলত ফোটো
জন্মদিনের পোশাকে তার গা
নাদুস-নুদুস দেখাত আর
শুধু-শুধুই ছুঁড়ত সে হাত-পা।
যেই একটু বড় হল, মুখে ফুটল খই,
তাই নিয়ে হৈচৈ,—
সে মুখে-মুখেই বানাল এক ছড়া
এবং তাতে দিল
জুতসই এক মিলও
ঘুঘুচা
পেটে ফু,
তিন-তিনে
চাপা চু।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিমল কর
এবং
ছোটদের কয়েকটি
আশ্চর্য বই

বিমল কর কয়েকখানি আশ্চর্য বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। তার মধ্যে 'ওআণ্ডার মামা' হল তুমুল হাসির। জাপান-ফেরৎ এক আজব মামার বিচিত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মজাদার বর্ণনা। 'কাপালিকরা এখনও আছে', অথবা 'রাজবাড়ির ছোরা'য় গা-ছমছম অ্যাডভেনচার ও রহস্য-কাহিনী। এ-যুগের এক কাপালিকের যাবতীয় চালাকি কীভাবে ধরে ফেললো কিকিরা নামে এক ম্যাজিসিয়ান আর সেই কিকিরাই রাজবাড়ি থেকে হারানো এক মন্ত্রপুত ছোরার রহস্য কীভাবে ভেদ করলেন, তাই নিয়ে এই দুটি বই। আরেকটি বই 'হারানো জীপের রহস্য'—'রাজবাড়ির ছোরা'র সঙ্গে এক মলাটে বেরিয়েছে—এক দারুণ কল্পবিজ্ঞান কাহিনী। সব-নতুন বই 'অলৌকিক'।

বিমল করের বই
রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১২·০০
ওআণ্ডার মামা ৭·০০ অলৌকিক ১০·০০ কাপালিকরা এখনও আছে ৮·০০

আরো অনেক বই

কুন্তক-এর শব্দ নিয়ে খেলা ১০·০০ সংকর্ষণ রায়ের গভীর গহন ৭·০০ ননীগোপাল চক্রবর্তীর চরকাবুড়ি ৬·০০ যাদুঘরে চলো যাই ৬·০০ পীর ফকিরের আস্তানায় ৬·০০ গিরিধারী কুণ্ডুর টংসা চু ৫·০০ রাত একটা ৪·০০ সুবোধ ঘোষের সেই অদ্ভুত অভ্রখানি ৬·০০ বিমল মিত্রের রাজা হওয়ার ঝকমারি ৮·০০ দাশরথির বাহাদুরি ৮·০০ শিশিরকুমার মজুমদারের তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা ৮·০০ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটনো ৬·০০ সন্তোষকুমার ঘোষের দুপুরের দিকে ৮·০০ অন্নদাশংকর রায়ের হে রে বাবুই হৈ ৬·০০ মঞ্জিল সেনের ডাকাবুকো ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে: গবা কি সত্যি পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর নতুন গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত, পুলিশের সন্দেহ জাগায় সে গা ঢাকা দেয়। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পাবার পরে গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধবের বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে দলে টেনে ইতিমধ্যে কাকাতুয়ার সঙ্গে রামুকেও লুঠ করেছে ডাকাত সাতনা। গবা ও গোবিন্দ ডাকাতদের জঙ্গলে গিয়ে সাংকেতিক গান গায়; তারপর মরতে-মরতে ফিরে আসে। গোবিন্দকে ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির জানায় যে, সে নিহত হরিহরের ছেলে। ওদিকে অনুতপ্ত নয়নকাজল ও রামু ডাকাতদের হাত থেকে পালাবার সময়ে আর-একজনের হাতে ধরা পড়ে। সেই লোকটাও ডাকাতদের খুঁজছে। তারপর...

॥ ২৮ ॥

মশালের আলোয় সবার আগে সাত ফুট লম্বা সাতনাকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। হাতে টাঙ্গি।

ভয় খেয়ে নয়নকাজল রামুর হাত চেপে ধরে বলল, "আর রক্ষে নেই। দেশে আমার বিধবা মাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও ছোটদাদাবাবু।"

রামু অত ঘাবড়ায়নি। সে তো জানে কাকাতুয়াটাকে দিয়ে এখনো আসল কথা বলাতে পারেনি এরা।

দলটা কাছে এগিয়ে আসতেই দুটো মুশকো চেহারার লোক এসে খপাখপ রামু আর নয়নকাজলকে ধরে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

সাতনা গমগমে গলায় লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কে রে?"

লোকটা বেশ বুক চিতিয়েই জবাব দিল, "আমার নাম কিংকর। তুমি কেডা?"

"আমি সাতনা সর্দার।"

"ওঃ, তুমিই!" বলে লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল "তোমার দলেই নাম লেখাতে এসেছি। আমি বর্ধমানের শংকর মাঝির শাকরেদ। নাম শুনেছ?"

"শংকর মাঝি!" সাতনার গলায় রীতিমত ভক্তিশ্রদ্ধা ফুটে উঠল। নরম গলায় বলল, "এ দলে আসবে নাকি?"

"ইচ্ছে তো তাই।" বলে লোকটা জামার বুকপকেট থেকে বের করে সাতনার হাতে দিয়ে বলল, "এই হল শংকর মাঝির পাঞ্জা। বাঁকড়ো, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া যেখানে খুশি যে-কোনো দলে এই পাঞ্জা দেখালেই লুফে নেবে আমাকে। তবু তোমার দলেই এলাম কেন জানো? শুনেছি তোমরা একটা বড় দাঁও মারার ফন্দি এঁটেছ। সত্যি নাকি?"

সাতনার মুখটা একটু ব্যাজার হল। বলল, "সত্যি। তবে হিস্যা নিয়ে বেশি ঝাঁকাঝাঁকি কোরো না। আমাদের হিস্যাদার অনেক।"

সাতনা সর্দার তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শাকরেদদের বলল, "এ দুটোকে নিয়ে যা।" তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, "এদের তুমি পেলে কোথায়, ধরেই বা আনলে কেন?"

লোকটা বলল, "ওদের মুখেই শুনলুম যে, ওরা তোমার আস্তানা থেকে পালিয়েছে। তাই ভাবলুম যার দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি তার একটু উপকার করি গে।"

সাতনা মৃদু হেসে বলে, "দল আমার নয়। আজ বড় সর্দার এখানেই আছে। চলো তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই।"

"চলো।"

শাকরেদরাও ওদিকে রামু আর নয়নকাজলকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। এ-বাড়ির মাটির নীচে গোটাকয় চোরকুঠুরি আছে। তারই দুটোয় দু'জনকে ভরে বাইরে থেকে ঝপাঝপ তালা মেরে দিল তারা।

ভিতরে জমাট অন্ধকার। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। হাতে আর মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে বার বার। রামু বারকয় হাঁচি দিল নাক-সুড়সুড়ির চোটে। ঘরে কিছু নেই। না বিছানা, না চৌকি, না অন্য কোনো আসবাব। পায়ের নীচে শুধু ঠাণ্ডা মেঝে। তারই ওপর উবু হয়ে বসল সে। হাঁটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি মেরে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করতে-করতে ঢুলতে লাগল।

চোরকুঠুরি থেকে কখন ভোর হল তা টেরও পায়নি রামু। একটা লোক এসে দরজা খুলে যখন নড়া ধরে তাকে ছেঁচড়ে বের করে আনল, তখন সে দেখল বাইরে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

উঠোনের রোদে একটা দড়ির চারপাইতে বসে কাঁসার মস্ত গেলাসে খেজুর-রস খাচ্ছিল সাতনা। তার সামনে নিয়ে রামুকে খাড়া করা হল।

সাতনা একবার ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে গেলাসটা গলায় উপুড় করে বাড়িয়ে দিল বাঁ ধারে। গামছায় মুখ বাঁধা একটা মেটে হাঁড়ি নিয়ে মাটিতে বসে আছে একটা লোক। সে গেলাসটা তাড়াতাড়ি আবার ভরে এগিয়ে দেয়।

সাতনা রামুর দিকে লালচে চোখে চেয়ে বলে, "খুব খারাপ কাজ করেছিলে কাল রাতে। তোমার কি জানের পরোয়া নেই? কিংকরের হাতে পড়েছিলে বলে বেঁচে গেছ। নইলে জঙ্গল থেকে বেরোতেও পারতে না, বেঘোরে আমার দলবলের হাতে শিকার হয়ে যেতে।"

রামু কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

আরো কয়েক ঢোক খেজুর-রস খেয়ে সাতনা একটা মস্ত ঢেকুর তুলে বলল, "তোমাকে এবারের মতো মাপ করে দিতাম। বাচ্চা ছেলেদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কিন্তু খবর পেয়েছি, তোমার বাবা পুলিশে খবর দিয়েছে। তোমার খোঁজে লোকজনও লাগিয়েছে। কাজটা তোমার বাবা খুব ভাল করেনি। এখন যদি তোমাকে জ্যান্ত রাখি, তবে আমাদের মেলা ঝামেলা। তাই ঠিক হয়েছে তোমার মাথাটা কেটে নিয়ে তোমার বাবার কাছে পাঠানো হবে।"

বলে সাতনা আর-এক চুমুক খেজুর-রস খেল। আর রামুর খুব শীত করতে লাগল।

সাতনা ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলল, "বুঝেছ?"

রামু একটু কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, "আর নয়নদার কী হবে?"

"নয়ন?" বলে সাতনা অবাক হয়ে রামুর দিকে চেয়ে বলে, "নয়নের খবরে তোমার কী দরকার হে ছোকরা?"

"নয়নদার কিছু হলে তার বিধবা মা খুব কাঁদবে।"

"সে তো তোমার মা'ও কাঁদবে।"

"আমাকে কেউ ভালবাসে না। বাবা না, মা না।" বলতে বলতে আজ রামুর চোখে জল এসে গেল। গলাটা এল ধরে।

সাতনা গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও কেমন থমকে গেল একটু। বারকয় গলা খাঁকারি দিল। হঠাৎ তার মনটা বোধহয় নরম হয়ে পড়েছিল। সেটা ঝেড়ে ফেলতে একটা বিকট হাঁকার দিল, "নিয়ে যা। নিয়ে যা একে।"

লোকগুলো তাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পশ্চিম ধারে একটা ঢিবি, তার ওপাশে পচা ডোবায় মস্ত হোগলা-বন। ভারী নির্জন জায়গা। ঢিবি পেরিয়ে ডোবার ধারটায় রামুকে নিয়ে এল তারা। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। একদিকে ঢিবি আর অন্যধারে হোগলার বন থাকায় জায়গাটা লোকচক্ষুর আড়ালও বটে। যে দু'জন লোক রামুকে ধরে এনেছে তারা দু'জনেই ভীষণ তাগড়া জোয়ান। কালো চেহারা। মুখে রসকষ নেই। একজনের হাতে ঝকঝকে একটা ভোজালি। একজন রামুকে ধরে হাত দুটো মুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে চুল ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, "এই বয়সে মরণ না-ডাকলে কেউ বাঘের ঘরে ঢোকে!"

রামু কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিল না। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। গলা তেষ্টায় কাঠ। বুকটা দুঃখে বড় ভার হয়ে আছে। মরতে সে ভয় পাচ্ছিল না। শুধু দুঃখ হচ্ছিল তাকে কেউ ভালবাসে না বলে।

যে লোকটার হাতে ভোজালি সে একটা মসৃণ পাথরের মতো জিনিসে ভোজালিটা বারকয় ঘষে নিয়ে আঙুলে ধার দেখে নিল। তারপর বলল, "নে, হয়েছে। ভাল করে ধরিস। শেষ সময়টায় বড় ঝটকা দেয় কেউ কেউ।"

(ক্রমশ)

॥ ৩৫ ॥

ইস্টার্ন রেল লীগ জেতার পর চারিদিকে যখন অভিনন্দনের জোয়ার, দলের একজন ফুটবলারের মন কিন্তু ভারী হয়েই থাকল। আমার মাথার ওপর তখন খাঁড়া ঝুলছে। আই এফ এ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভায় আমাকে ডাকা হল। বালি প্রতিভার বিরুদ্ধে খেলায় যে-আচরণ করেছিলাম, তার কৈফিয়ত দিতে হবে।

এ-কথা সত্যি যে, একবার আমি বুট খুলে দর্শকদের দেখিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে আমার দিকে কী-রকম জঘন্য গালিগালাজ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা তো আর কমিটির সদস্যরা জানতেন না। এমন-কী, বাঘাদাও আমাকে ক্ষমা করেননি।

যাই হোক, অপরাধীর মতো আই এফ এ-র সভায় হাজির হলাম। লীগ জয়ে টীমের সকলেরই অবদান ছিল। কিন্তু এমন দিনও তো কম যায়নি, যখন টীমকে জেতানোর জন্য একাই এগিয়ে গেছি, শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে লড়াই করেছি। আর লীগ জেতার পর আমাকে কিনা হাজির হতে হচ্ছে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভায়, অপরাধী হিসেবে! এবং এক্ষেত্রে, আমার পিছনে নিজের ক্লাবও নেই।

কমিটির দু-এক জন সদস্য আমার সমালোচনা করবেন। একজন আবার খবরের কাগজের নির্দিষ্ট অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু হেমন্ত দে বললেন, "আমি প্রদীপকে অনেক দিন ধরে জানি। মাঠে খারাপ ব্যবহার করে না। বালি প্রতিভার বিরুদ্ধে খেলার দিন নিশ্চয় অন্যায় করেছে, কিন্তু এজন্য শুধু ওকেই দায়ী করা ঠিক নয়। আমরা আশা করব, প্রদীপ আর কখনও এমন করবে না। শাস্তি দেওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই।"

তখনকার বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের ভাগ্যবিধাতা এম দত্তরায় শুরু করলেন বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই— "তুমি নিজেকে কী মনে কর, স্ট্যানলি ম্যাথুজ, না সামাদ? কেউ তোমাকে সমালোচনা করবে না, এইরকম আশা কর নাকি?"

তারপরই, কিছুটা সুর পালটে বললেন: "হুঁ, সামাদ নাকি রাগত না! একবার কী হয়েছিল জানো, সামাদ যখনই বল ধরে, আমি পিছন থেকে জাপটে ধরি। ছেড়ে দিলে সামাদকে ধরার সাধ্য কার আছে? আমি খেলছিলাম মাথায় লাল পট্টি বেঁধে। প্রথমবার, জাপটে ধরায় সামাদ বেশ মজাই পেল। কিন্তু বারবার একই জিনিস হতে থাকায় আমার দিকে ফিরে গালাগালি দিতে লাগল। হুঁ, রাগত না, না রেগেই গালাগালি করত!"

বেচুদার (এম দত্তরায়) বক্তব্যে এবং বলার ভঙ্গিতে সকলেই হেসে উঠলেন। সভার আবহাওয়া হালকা হয়ে গেল। বেচুদা পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আর কখনও এমন করিস না। তুই ইণ্ডিয়া টীমের অ্যাসেট, তোর কি মাঠে এমন কিছু করা উচিত যাতে বাচ্চা ছেলেরা খারাপ শিক্ষা পায়?"

এম দত্তরায়ের অনেক সমালোচনা হয়েছে এবং হয়। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি

আন্তঃ রেল ফুটবলে বিজয়ী ইস্টার্ন

অবিচারও করে ফেলেছেন। কিন্তু এ-কথা লিখতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই যে, বাংলার ফুটবল ও ক্রিকেটের জন্য তিনি যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। পঙ্কজ গুপ্ত ছাড়া আর কোনো বাঙালিই ভারতবর্ষের খেলাধুলোর জগতে বেচুদার মতো এত প্রবল কর্তৃত্ব করেননি। এক সময়ে, বেচুদা একই সঙ্গে ছিলেন ভারতের ক্রিকেট ও ফুটবলের নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, বাংলার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেননি।

লীগ শেষ হওয়ার পর, ভারতীয় দলের সঙ্গে বার্মা সফরে গেলাম। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে রহমান এবং রহমতুল্লা শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। চুনী গোস্বামীও ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায় যাননি। দলের অধিনায়ক আজিজ। দলের সঙ্গে গেলেন আরও পনেরো জন—নারায়ণ, লতিফ, রাম বাহাদুর, কেম্পিয়া, নিখিল নন্দী, বীর বাহাদুর, আমেদ হোসেন, কানাইয়ান, দামোদরন, পি কে ব্যানার্জি, বলরাম, এস গুহ, ভারালু, কানন ও পবিত্রন। ঠিক হল পরদিন রহমতুল্লার বদলে ইস্টবেঙ্গলের নারায়ণ রেঙ্গুন যাবেন। দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে রবীন গুহেরও নারায়ণের সঙ্গে যাওয়ার কথা ঠিক হল।

সামনেই আন্তঃরেল ফুটবল। তাই আরও ঠিক হল, বার্মায় দুটি ম্যাচ খেলে নিখিল নন্দী আর আমি ফিরে আসব।

প্রথম খেলায় বার্মা সিভিলিয়ান একাদশকে আমরা হারালাম এক গোলে। আমার কর্নার কিক থেকে হেড করে গোল করলেন ভারালু। পরদিন সেনাবাহিনী একাদশের বিরুদ্ধেও আমরা জিতলাম।

খড়গপুরে আন্তঃরেল ফুটবলের ফাইনালে উঠলাম তিনটি ম্যাচ জিতে। ফাইনালে দেখা হল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে (মেরুন) দলের সঙ্গে।

আমরা খুব দ্রুত লয়েই খেলা শুরু করলাম। তবে গোল পেতে দেরি হল। হাফটাইমের মিনিট-দশেক আগে আমার পাস থেকে দুর্দান্ত শট নিলেন সুনীল নন্দী। সুনীলের শট কোনোরকমে ফেরালেন গোলকীপার এস বসাক। গোলে বল ঠেলতে আমি একটুও দেরি করিনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই নিখিল নন্দীর দর্শনীয় শট বারের নীচে লেগে গোলে ঢোকায় আমরা ২-০ গোলে জিতে গেলাম।

কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা অবশ্যই অনেক বড় সাফল্য পেয়েছিলাম। তবু, আন্তঃরেল ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েও কম আনন্দ হল না। চ্যাম্পিয়ন হতে কার না ভাল লাগে।

(ক্রমশ)

লীগজয়ী ইস্টার্ন রেল-দলের সম্বর্ধনা

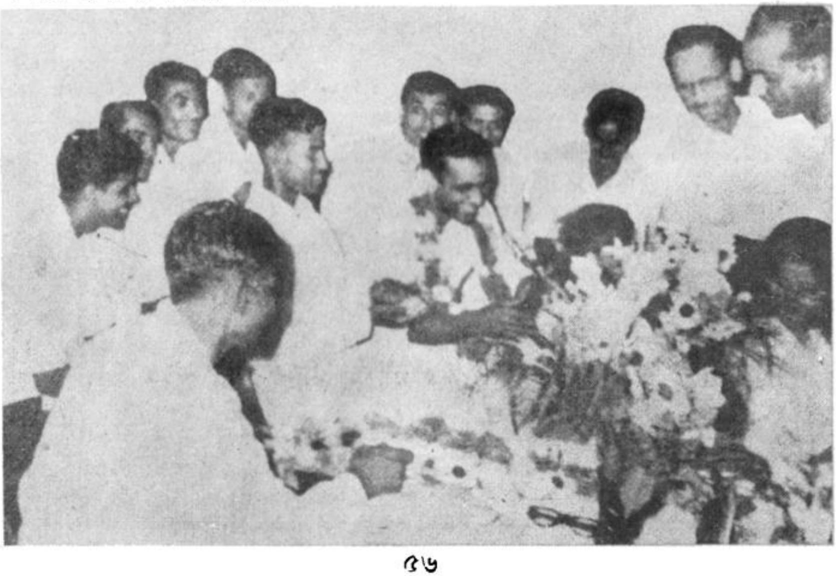

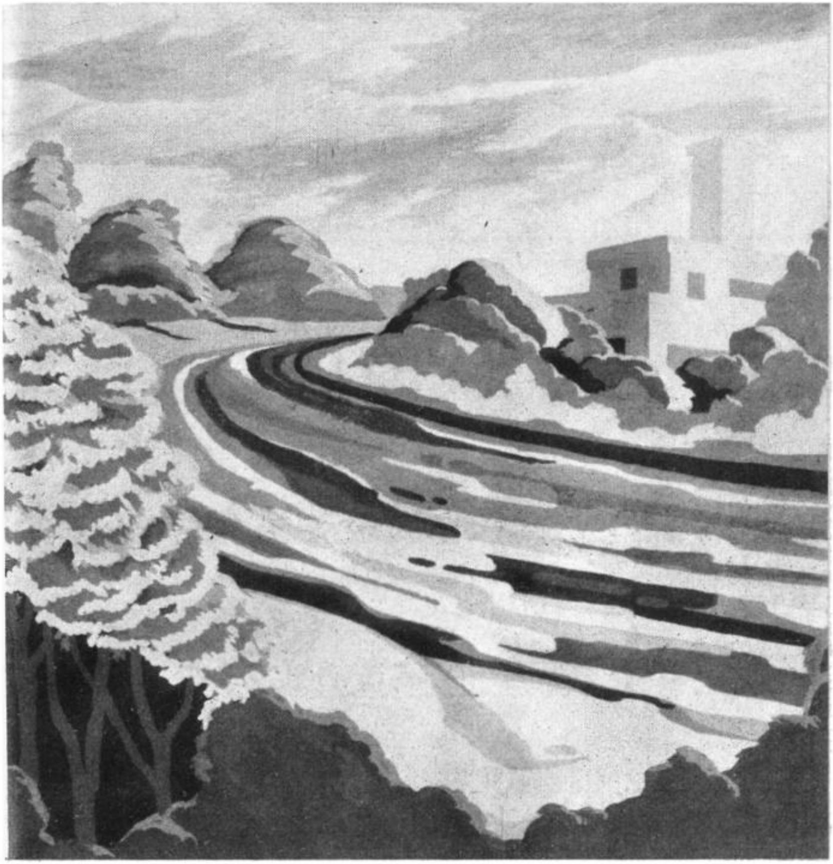

ভূপতি ও আমি

মৃত্যুঞ্জয় সেন

অদ্ভুত ঘটনাটার জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না। আমার সহকর্মীরাও না। তাঁরা রীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আমি পেয়েছিলাম ভয়ঙ্কর ভয়।

জলাঙ্গী আর গঙ্গা যেখানে মিশেছে তার পাড়েই আমাদের অফিস। তখন আমি মাসখানেক হল অফিসের কাজে যোগ দিয়েছি। সেদিন সন্ধে। শীতের শুরু। ছোট অফিসে অল্প লোক। বেলা-শেষে সকলেই প্রায় চলে গেছেন। দু-একজন থেকে গেছেন আমাকে সাহায্যের জন্যে। নতুন কাজ—তাঁরা বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমাকে। তাছাড়া তাঁরা হলেন আমার বাবার পুরনো সহকর্মী। বাবার প্রতি তাঁদের ভালবাসা, শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি হিসেবে তাঁরা আমাকে আমার অফিসের কাজটাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আর সেই সময়েই কাণ্ডটা ঘটল।

আমি অবশ্য এমন ভয় ঠিক ঐ অফিসের ওখানেই আর একবার পেয়েছিলাম। সে প্রায় ষোলো-সতেরো বছর আগের কথা। কিন্তু আশ্চর্য, দুটো ঘটনাই প্রায় সমান ধরনের এবং তার নায়ক সেই ভূপতিই। আমার অফিসের ঐ সাইটে আমি প্রথম যাই আমার বাবার সঙ্গে। বাবা তখন ওখানকার ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর নেতৃত্বে ওখানকার গঙ্গায় কাজের জন্য কয়েক কোটি টাকার প্রোজেক্ট শুরু হয়। তখন ওখানে তাঁর

অফিসের এই নতুন সাইটটি তৈরি করা হয়। বাবার অফিসের অন্যান্য অফিসার এসে রেস্ট নেবেন বলে অফিসসংলগ্ন বিরাট এলাকা ঘিরে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়। রেস্ট হাউসের পিছন দিকটা জলাঙ্গী নদীর পাড়ে।

সে সময় আমার মায়ের শরীর খারাপ ছিল। বাবা তাই আমাদের সকলকে কয়েকদিনের বিশ্রামের জন্যে সেই রেস্ট হাউসে নিয়ে যান। শীতে চারিদিকে মরসুমি ফুলে সাজানো রেস্ট হাউস, তার ওপরে নানান গাছগাছালিতে ভরা বিরাট এলাকা, গাছে গাছে হরেক রকমের পাখি। আমি যেন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরছি।ওদিকে জলাঙ্গীর পাড়ে একটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট। সন্ধেবেলায় বাবার অফিসের কয়েকজন এসে সেখানে খেলতেন। কী মজায় দিনগুলো কেটেছিল সেবার।

বাবা তো ছিলেন ওখানকার কর্তা—তাই সকলে ওঁকে স্যার, বাবু বলে সম্বোধন করত। কিন্তু ভূপতিকে কোনো সময়েই ঐ ধরনের সম্বোধন করে বাবাকে ডাকতে শুনিনি। সে ছিল বাবার খাস বেয়ারা। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ছায়ার মতো থাকত। কিন্তু আমি আসার পর সে বাবাকে ছেড়ে আমাকে ধরল। সর্বদা সেই-ই আমাকে নিয়ে নিয়ে ঘোরে। আমি কিন্তু ভূপতিকে এড়িয়ে এড়িয়ে যেতাম। ও আমাকে যতই সঙ্গ দিতে চায় আমি ততই ওকে নানান কাজ দিয়ে কথা বলে সরিয়ে রাখি। আসলে ও যখন-তখন বিশ্রীরকমের খ্যাক খ্যাক হাসত। তখন ওর সারা শরীর কেমন যেন তালগোল পাকাত। ওর হাসিতে দেখেছি অন্যদের কোনো ভাবান্তর হত না। বরং ব্যাপারটা উলটো হত। বাবার কথা বাদ—তিনি এমনিতে গম্ভীর ধরনের লোক ছিলেন। কিন্তু মা? তিনি তো ভূপতির এই হাসি দেখেই বাবাকে খাবার টেবিলে বলেছিলেন, "তোমার হেল্পারটি কিন্তু বেশ, সব কথাতেই হাসে।"

মনে আছে সেবার ওখান থেকেই কদিন পরেই বাবাকে কী একটা কাজে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কৃষ্ণনগর যেতে হয়েছিল। তার মানে তখন ভূপতির আর কোনো কাজ নেই। তাই আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ। জলাঙ্গীর পাড়ে তখন নেট টাঙিয়ে আমাদের ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস চলছে। আমি কিছুক্ষণ খেলে কোর্টের পাশে রাখা চেয়ারে বসে রোদ পোহাতে শুরু করেছি।

জীবনের মূলে গাছ

তোমরা অনেকেই এখন গাছ সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছো।

তোমরা যে শুধু গাছ লাগিয়েছো তাই নয় কোথায় কি কি গাছ লাগিয়েছো সেটা চিঠি লিখে আমাদের দপ্তরে জানাতেও ভোলো নি। খুব ভাল লেগেছে তোমাদের এই তৎপর সহযোগিতা। সেজন্য তোমাদের সকলকে সি, এম, ডি, এ-র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গাছ নিয়েই যখন কথা শুরু হলো তখন গাছের কথাই আলোচনা করা যাক আজ। আচ্ছা তোমরা কি জান যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন রয়েছে তা গাছেরই অবদান? কোটি কোটি বছর ধরে ভূ-পৃষ্ঠ জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেই জঙ্গল বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করে সূর্যরশ্মির সাহায্যে অক্সিজেন দান করেছে পৃথিবীকে। যার ফলে একদিন অক্সিজেনগ্রাহী প্রাণী ও মানুষের জন্ম সম্ভব হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। এবং গাছ কাটতে কাটতে একদিন এমন হবে যখন শ্বাস নেওয়ার মত অক্সিজেন আর বায়ু মণ্ডলে অবশিষ্ট থাকবে না। এছাড়াও নানা রকম পশু, পাখি, কীট পতঙ্গের জীবন ও জীবনচক্র সম্পূর্ণ হ'তে প্রয়োজন নানান ধরণের আগাছা ও গাছ। এই সব কীট, পতঙ্গ, পাখিরা আবার বহু ভাবে ফসল রক্ষা ক'রে ও বিষাক্ত কীট, পতঙ্গ নাশ ক'রে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে।

তাহলে বুঝতে পারছো মানব সভ্যতার সূচনার মূলে রয়েছে গাছ? গাছই এই পৃথিবীতে মানুষকে ডেকে এনেছে। আবার মানব জীবনের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে।

সেইজন্যই পৃথিবীর সর্বত্র এসেছে বৃক্ষ-সচেতনতা। মানব সভ্যতার প্রয়োজনে গাছ কাটতেই হয়—আবার সভ্যতার প্রয়োজনেই গাছ লাগানো দরকার। ভাঙ্গা এবং গড়া, এই নিয়েই যেমন পৃথিবী।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ ৩এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

এমন সময় হঠাৎ ভূপতি আমাকে চেয়ারসুদ্ধু উঁচুতে তুলে ধরে সেই বিশ্রীরকমের খ্যাক-খ্যাক হাসি হাসতে লাগল। এভাবে ও বোধহয় আমাকে আদর করেছিল—কিন্তু ওর পাকানো-পাকানো ঢেউ-খেলানো শরীর দেখে আর হাসি শুনে আমার এমন ভয় হয়েছিল যে, নির্ধারিত সময়ে বাড়ি ফিরে না এলে হয়তো আমি অসুখে পড়ে যেতাম। ভূপতি আমাকে চেয়ারসুদ্ধু ওপরে তুলে খ্যাক-খ্যাক করছে আর সকলে সে দৃশ্য দেখে হাসছে। আমাকে ও ওপর থেকে চেয়ারসুদ্ধু ছেড়ে দেবে না সেটা তখন বোঝার মতো বুদ্ধি আমার হয়েছিল—তবুও কেন যে ভয় পেয়েছিলাম জানি না।

এর পর ভূপতির সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। শুনেছিলাম রেস্ট হাউসে একবার কারা বেড়াতে এসেছিলেন। সেখানে তাঁদের কী যেন দামি জিনিস হারিয়ে যায়। সকলের ধারণা যে ভূপতি সেটা সরিয়েছে। এর পর বাবা তাকে অফিসের আর এক সাইটে বদলি করেন। সেখানেও অফিসের কী-সব জিনিস খোয়া যায়। তারপর ওকে নিয়ে নানান রিপোর্ট ফিপোর্ট হয়। শেষে ভূপতির চাকরি চলে যায়।

আর একটা কারণ হল, বাবা একবার সরেজমিনে তদন্ত করতে গঙ্গায় ড্রেজিং ওয়ার্ক দেখতে গিয়ে ফ্লোটিং পাইপের তলায় চাপা পড়ে মারা যান। সুতরাং বাবার চাকরির সূত্র ধরেও ভূপতির সঙ্গে আমার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না।

অবশ্য ভূপতিকে নিয়ে আমারও ভাববার সময় ছিল না। পরে মামার বাড়ি থেকে কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনো করতে হয়েছে। তাছাড়া মায়েরও ইচ্ছা ছিল আমি যেন বাবার মতো হই। যেহেতু কর্মরত অবস্থায় বাবা মারা যান, সেহেতু পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাবার অফিসে চাকরি পেয়ে গেলাম। পোস্টিং সেই সাইটে।

কাজে যোগ দিয়ে আমি খুব রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম। কারণ আমার বাবা সেই গঙ্গা-জলাঙ্গী পাড়ের সাইটেই এক সময় সর্বেসর্বা ছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে ভূপতির কথা ভাবছিলাম। একজনকে ভূপতির কথা বলেওছিলাম। সে বলল, "পায়রাতলা সাইটে চুরি করার জন্যে ওকে চাকরি থেকে ডিসমিস করার পর আর কেউ ওকে দেখতে পায়নি। ওর নাকি বিহার-টিহারের দিকে দেশ ছিল। তবে ওর তো সংসারে নিজের বলতে কেউ ছিল না। কী জানি তারপর কী হয়েছে! আপনি কী করে তার নাম জানলেন স্যার? পুরনো রেকর্ড দেখেছেন?"

এর পরের দিনই ভূপতির আবির্ভাব। আমরা সন্ধের পরে গভীর মনোযোগ দিয়ে অফিসের কাজ করছি, এমন সময় সে কখন পিছন দিক থেকে এসে আমাকে চেয়ারসুদ্ধু উঁচু করে তুলে সেই সেবারের মতো খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল। আমার অফিসের সহকর্মীরা তো হকচকিয়ে গেলেনই। আমি পেলাম ভয়—সেই ভয়, যে ভয় বহুদিন আগে ছোটবেলায় পেয়েছিলোম।

উপস্থিত সকলে ভূপতির হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করল। ছুটে এল দারোয়ান চতুর্ভুজ। ভূপতি অবজ্ঞাভরে চেয়ারসুদ্ধু নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে সেই পাকানো-পাকানো হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আশ্চর্য, ভূপতি শীর্ণকায়, প্রায়-বৃদ্ধ আমার মতো এক যুবককে কত সহজে চেয়ারসুদ্ধু ওপরে তুলে ফেলেছিল। ভূপতিকে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু বললেন, "না, ডাকবেন না।"

আমি বললাম, "কেন"।

তিনি কেমন যেন ভয়জড়ানো কণ্ঠে বললেন, "চাকরি যাবার পর এই প্রথম ভূপতিকে দেখা গেল। সাবধান!"

সন্ধেয় বিনয়বাবু বললেন, "কী অবাক কাণ্ড দেখেছেন স্যার, ভূপতির হাসিটা কিন্তু ঠিক আগের মতো আছে।"

ভূপতির হাসির কথা শুনে আমি আবার যেন ভয় পেলাম। অবিনাশবাবুর কথামতো ওকে আর ডাকলাম না।

পরের দিন ভোরে অবিনাশবাবু ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলেন, "স্যার, ভূপতি কাল রাতে মারা গেছে। গঙ্গার পাড়ে পড়ে আছে।"

ভূপতিকে দেখতে খুব ইচ্ছা হল। গিয়ে দেখি, ওর মুখে সে হাসি নেই। বড়-বড় চোখে ও যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই চোখ দিয়ে যেন রাগ, বিরক্তি ঠিকরে পড়ছে।

ছবি: রতন সেন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

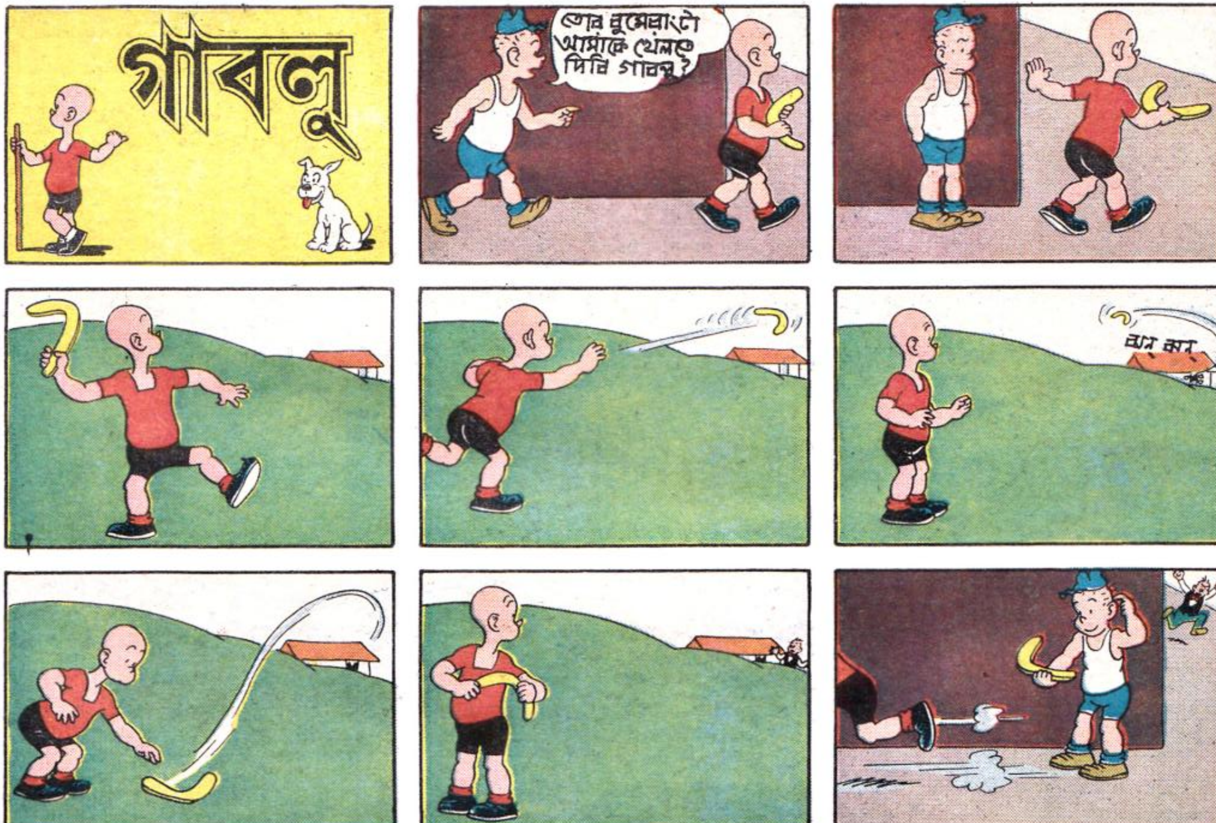
গাবলু
তোর বুমেরাংটা আমাকে খেলতে দিবি গাবলু?
ঝন ঝন

৮ বাংলা বলো

র-ফলার খেয়াল

বাচস্পতি

"তার মানে শব্দের গোড়ায় র-ফলার সঙ্গে যদি 'অ' থাকে সেটা 'ও' হয়ে যাবে?" ভণ্টু জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় এটা হল আর একটা জায়গা যেখানে 'অ' 'ও' হচ্ছে।" বলে ভণ্টুকে বললেন, "আমার থলেতে একটা বাংলা ডিকশনারি নিয়ে এসেছি, বার করো।"

ভণ্টু হিগিনের ব্যাগ থেকে একটা বাংলা অভিধান বার করল। তখন হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলা ডিকশনারি থেকে শব্দ খুঁজে বার করতে পারিস?"

ভণ্টু 'হ্যাঁ' জানানোতে হুকুম দিলেন, অ-ওয়ালা যে-সব র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন নিয়ে আছে শব্দের গোড়ায়, সেগুলো পড়ে যাবার জন্যে। ভণ্টু পাতা উলটে প্রথমেই বলল 'ক্রকচ'!

"কাট! কাট!" হিগিনকাকু ফিল্‌মের ডিরেক্টর যেন, বললেন, "ও-সব ক্রকচ-ফকচ চলবে না! হটাও হটাও! আমরা মুখের কথায় যে-সব শব্দ ব্যবহার করি সেগুলো পড়ো!"

ভণ্টু এবার 'ক্রতু' পড়তেই হিগিনকাকু প্রায় খেপে উঠলেন, বললেন, "আরে এখানে পরে তো 'উ' রয়েছে, ওখানে তো এমনিতেই 'অ' 'ও' হবে। তুই বাবা একটু দয়া কর্ আমার ওপর। এমন শব্দ পড়তে থাক যেগুলো আমরা হরহামেশা ব্যবহার করি, আর যেগুলোতে ঐ অ-এর পরে 'ই' বা 'উ' অর্থাৎ [+ -ঊর্ধ্ব] স্বরধ্বনি নেই। বুঝেছিস?"

ভণ্টু এবার ঠিক-ঠিক পড়তে লাগল, 'ক্রন্দন, ক্রয়,...' এইভাবে। কিন্তু 'ক্রয়'-এ এসে থমকে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এ কী হল?"

হিগিন দুষ্টুমিভরা চোখে বললেন, "কী সমস্যা?"

ভণ্টু বলল, "তোমার নিয়মে 'ক্র' 'ক্রো' হবে, কিন্তু 'ক্রয়' তো ক্রয়ই, 'ক্রোয়' বলছি না তো আমরা!"

হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, "শাবা—শ ছেলে! ঠিক ক্যাচ করেছিস বাবা। শোন্, এটা আবার 'অয়্'-এর কারসাজি। 'অয়্'-এর 'অ' কক্ষনো 'ও' হয় না। ফলে 'ক্রয়' ক্রয়ই থাকবে, 'শ্রয়' (আশ্রয়)-ও 'শ্রোয়' হবে না।"

বাবা বললেন, "আরেকটা শব্দ বোধ হয় আছে, যেখানে শব্দের গোড়ায় ঐ 'ব্যঞ্জন + র-ফলা + অ'-এর 'অ'-টা 'ও' হচ্ছে না। তা হল 'হ্রদ'। 'হ্রোদ' বললে সব্বাই হাসবে।"

"আচ্ছা মেজদা, তোমরা বাপে-ছেলেতে আজ কী খেল্ দেখাচ্ছ বলো তো! এ-সব দারুণ-দারুণ ঠিক কথা বলে আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছ কেন?" হিগিনকাকু মিথ্যেমিথ্যি রাগের সুরে বললেন কথাটা।

বাবা হাসলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু বাকি সব গোড়াকার ক্র-, গ্র-, ত্র-, দ্র-, প্র-, ব্র-, ভ্র-, শ্র-, স্র-, সব 'ও' দিয়ে উচ্চারিত হবে তো?"

ভণ্টু বলল, "সে তো বটেই। এগুলো তো আমরা 'ও' দিয়েই বলি, তাই না? যেমন ধরো, 'ক্রোন্দন, ক্রোম, গ্রোস্থ, গ্রোহ, ত্রোস্ত, দ্রোষ্টা, প্রোকট, প্রোকাশ, প্রোবাল, প্রোভাত, প্রোজা, প্রোণাম, ব্রোজ, ভ্রোম..."

হিগিনকাকু শ্লেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, 'ভ্রম' বললে ভ্রম হবে, তোমাকে 'ভ্রোম' বলতে হবে।"

ভণ্টু আবার বলতে লাগল— "শ্রোদ্ধা, শ্রোবণ..."

হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, "ব্যস ব্যস— এ তো রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটিয়েছিস বাবা, আর শেষ হতেই চায় না। মোদ্দা কথাটা হল এই যে, ঐ 'ক্রয়', 'শ্রয়' আর 'হ্রদ' বাদ দিয়ে আর সব জায়গায় আমরা 'ও' পাচ্ছি।"

বাবা বললেন, "ভাষাবিজ্ঞানী, আরো তো 'ও' পাচ্ছি, যেখানে 'অ' থাকার কথা।"

হিগিনকাকু চোখ টিপে কলকাত্তাই ভাষায় বললেন, "কোতায় পাচ্চ সে 'ও'-টিকে?"

বাবা বললেন, "কেন? আমরা বলছি 'ক্রোন্দোন্', গ্রোহো, গ্রোন্থো, গ্রোস্তো। উচ্চারণে তাই হচ্ছে। বানানে নেই। ও-সব 'ও' আসছে কোত্থেকে?"

হিগিনকাকু বললেন, "চাইনিজ খাবার মুখে না দিয়ে আমি আর একটা কথা বলব না!"

(ক্রমশ)

বেচারি মিলি

প্রসাদ

অনেক দিন মা গল্প বলেননি। চামেলি যখন খুব ছোট ছিল মা রোজ রাত্তিরে ঘুমোবার সময়ে গল্প বলতেন। তা ছাড়া বৃষ্টির দিনে গল্প বলতেন, জ্বর হয়ে বিছানায় যখন শুয়ে থাকত, কত গল্প বলতেন ছবির বই দেখিয়ে-দেখিয়ে। আর এখন চামেলি নিজেই গল্পের বই পড়তে পারে। তবু মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে করে মার কাছে গল্প শুনতে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ কী জানি কেন তার মন খারাপ করে উঠল। মা বসে-বসে উল বুনছিলেন, চামেলি মার কোল ঘেঁষে বসে পড়ল।

Tell me a story, Mummy.

Why, Milly, you have your story books. Why don't you read a story if you want to? Daddy bought you a book only the other day, a nice big book with wonderful stories in it. Surely, you can't have finished it already?

No, but I want to hear you tell a story.

Very well, then. Bring me your new book. I'll read you a story from it.

Oh, no, Mummy. Just tell me a story, don't read me one. It's not the same thing.

Well, let's see. Do I remember any stories? I'll try to think of one. Give me some time. Now, what about Snow White and the Seven Dwarfs? Would you like to hear that?

Not Snow White, Mummy, I almost know that by heart.

Red-riding-hood, then?

And the wolf? I know that one, too.

Cinderella?

Cinderella! I know every word of it.

You seem to know all the stories I know. If you know some more, you can tell me one instead. Or you can lend me your new story book so that I may read some new stories and tell you a few afterwards.

Please, Mummy, tell me a story now. You used to know so many.

Now, will you stop bothering me? I've got to finish this vest for Daddy today. Find some way to amuse yourself.

তখন বেচারি মিলি আর কী করে? বাইরের ঘরে বাবার কাছে গেল, যদি কিছু সুবিধে হয়। বাবা টেলিফোন করছিলেন। মিলিকে দেখে ফোনের মুখটা চাপা দিয়ে বললেন:

Milly, bring me a pencil, will you? And hand me that pad on the book-case.

তারপর, কাগজ আর পেনসিল নিয়ে আবার টেলিফোনে কথা বলতে আরম্ভ করলেন:

What was that address, again?

Yes, I've got it down.

I'm sure a holiday by the sea will do you a lot of good.

Have you paid them the rent in advance?

I'm glad you can get away. We surgeons allow ourselves too little rest.

লক্ষ করো:

Daddy bought you a book.
Bring me your new book.
I'll read you a story.
Hand me the pad.
A holiday will do you a lot of good.
Have you paid them the rent?

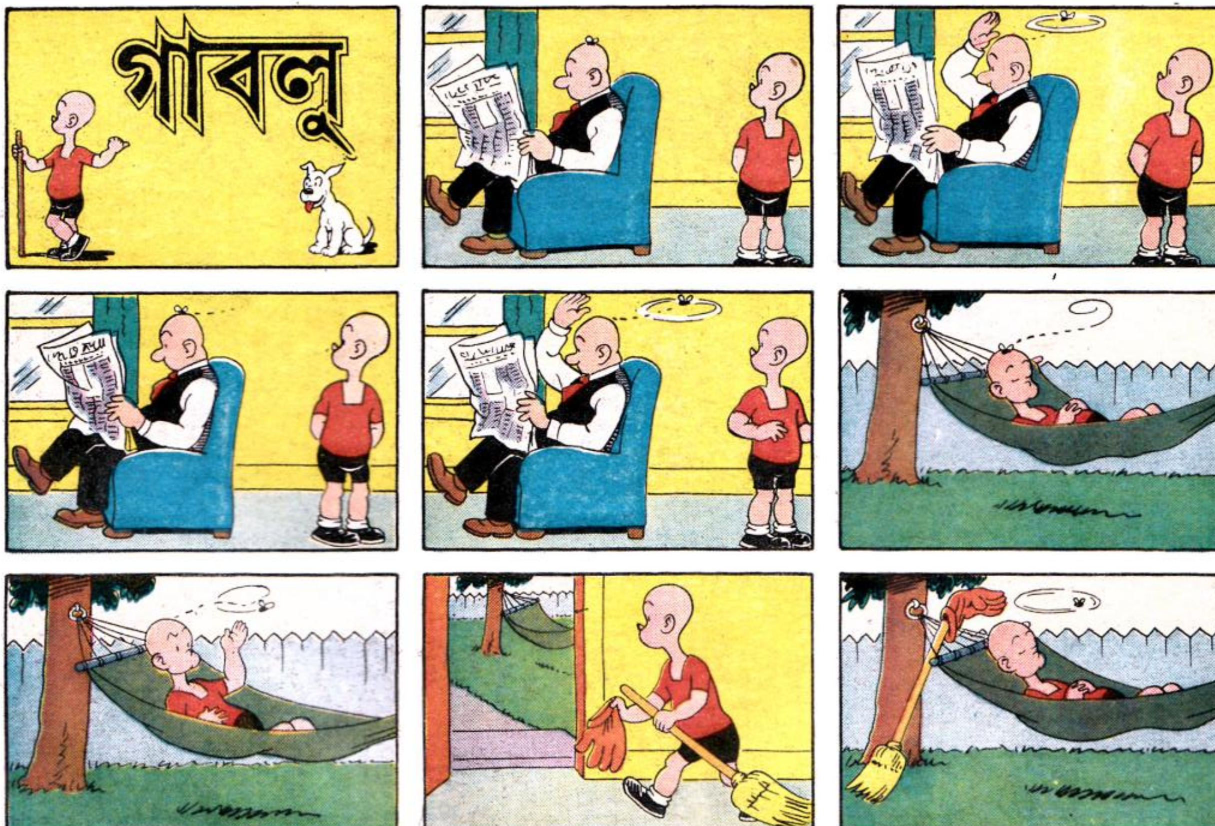
গাবলু

বাঘা

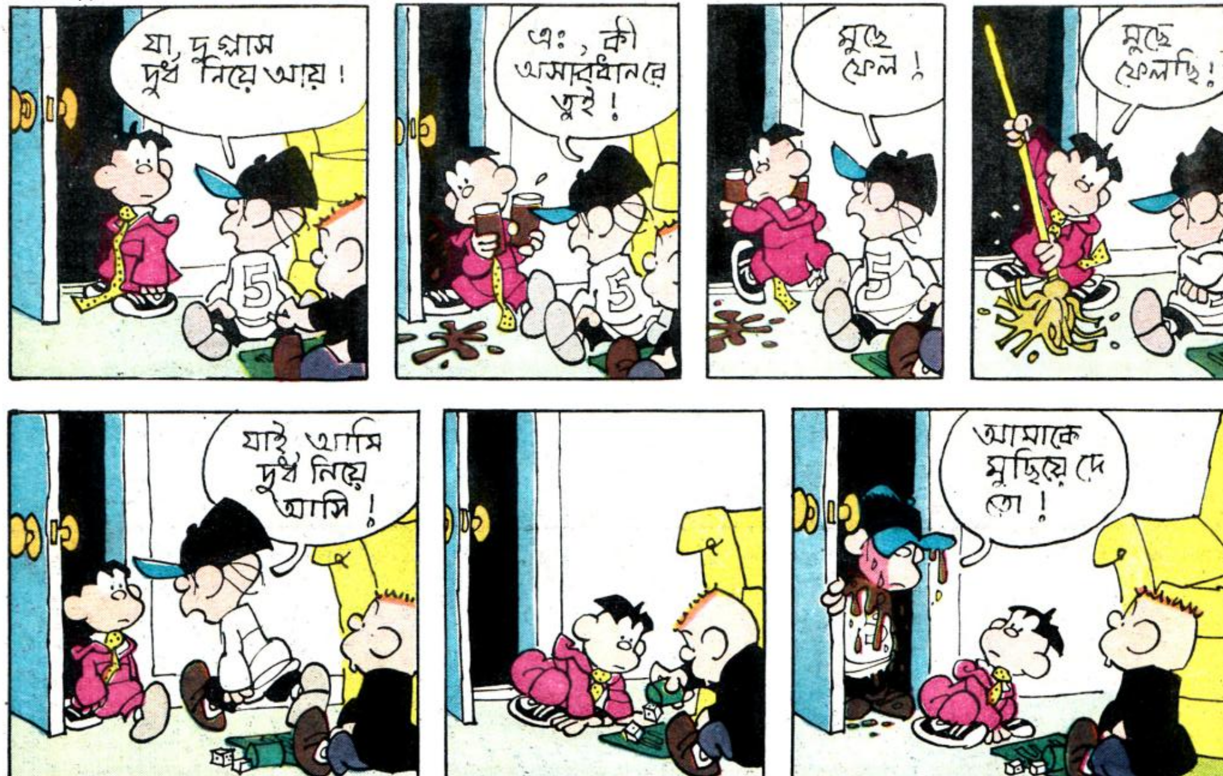

ডিম থেকে পাখি

প্রত্যেকবার ডিম থেকে মামুলি পাখি পাওয়া যাচ্ছিল, এবার থেকে ভাবতে হবে ডিমের ভেতর দিয়ে বিশেষ বিশেষ পাখিকে তার চরিত্র-সমেত কীভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ডবোর্ডের কাজ : ঢাকা-সমেত বাক্স

তোমার পছন্দমতো মাপের সাদা বোর্ড নিয়ে তাকে সমান ১২ ভাগে ভাগ করে নিয়ে নমুনায় দেখানো কালো দাগ দেওয়া অংশগুলিকে কেটে বাদ দাও, কেবল কোনা-কাটা ৩ নং অংশগুলিকে রেখে।

ফোঁটা-দেওয়া দাগের ওপর ভাঁজ করার সুবিধের জন্য চাপ দিয়ে 'ক' নকশা-মাফিক মুড়ে জুড়ে দিলেই তোমার হাতে ঢাকনা-দেওয়া বাক্স রেডি।

জেনে রাখো—(১) ভাঁজ করার সময় বিশেষ নজর দেবে যাতে সমান ভাবে হয়। (২) বাক্স শেষ হলে ইচ্ছেমতো চার পাশে নকশা করতে বাধা নেই। (৩) যত বড় বাক্স করবে তত শক্ত বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।

কারিগর

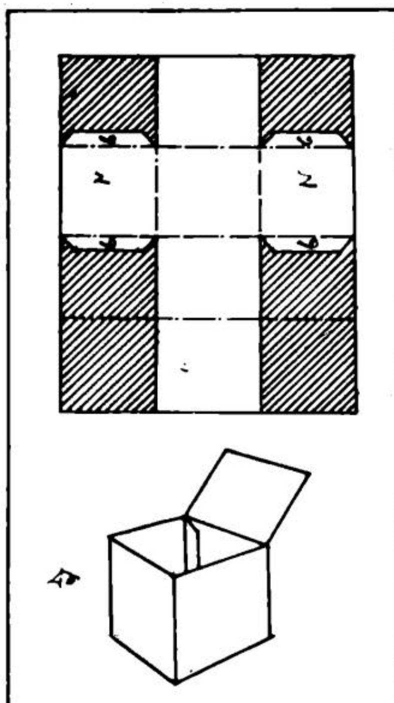

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN.

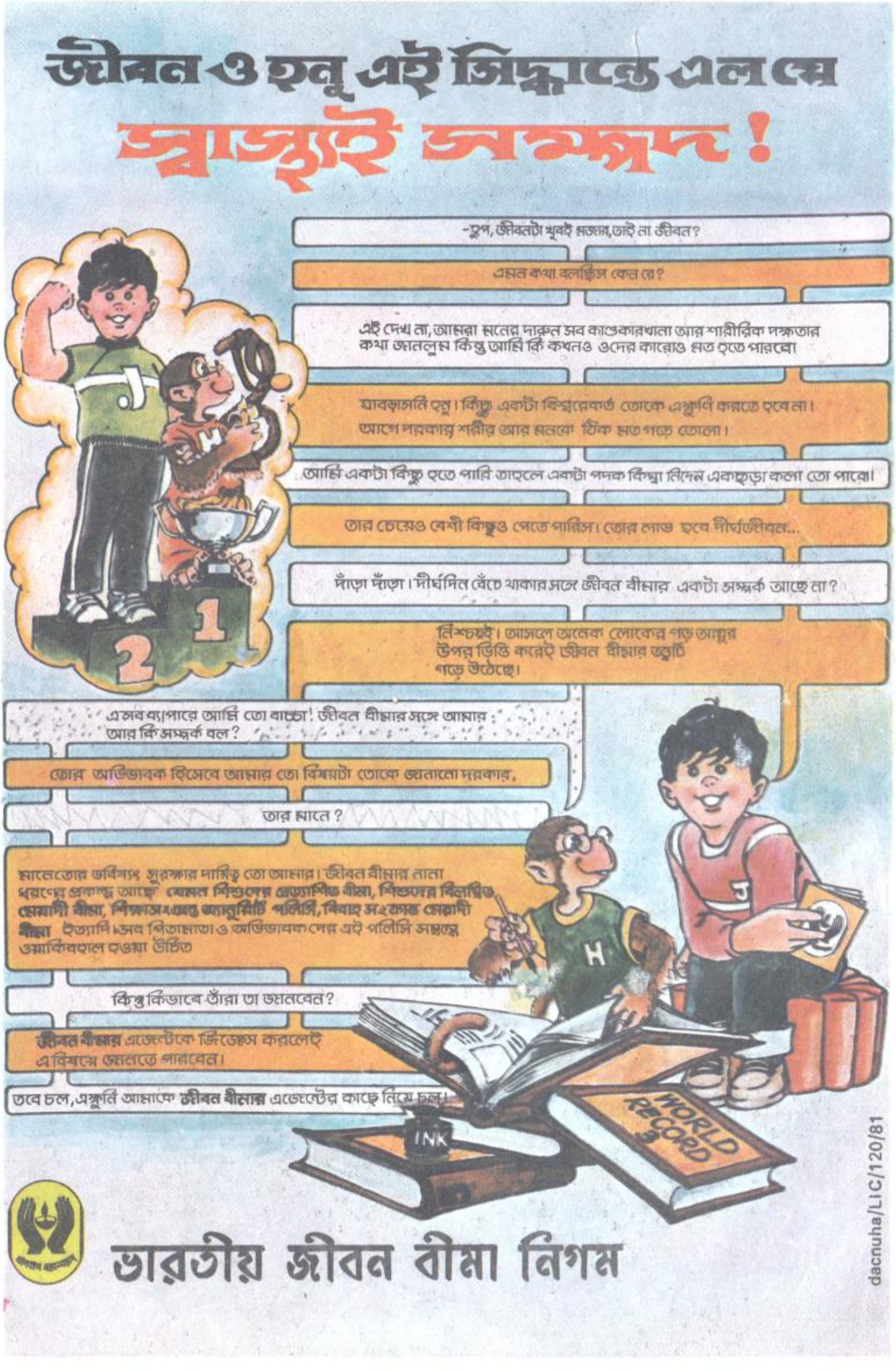
জীবন ও হনু এই সিদ্ধান্তে এল যে
স্বাস্থ্যই সম্পদ!
-হুপ, জীবনটা খুবই মজার, তাই না জীবন?
এমন কথা বলছিস কেন রে?
এই দেখ না, আমরা মনের দারুন সব কাণ্ডকারখানা আর শারীরিক দক্ষতার কথা জানলুম কিন্তু আমি কি কখনও ওদের কারোও মত হতে পারবো
যাবড়াসনি হনু। কিছু একটা বিশ্বরেকর্ড তোকে এক্ষুণি করতে হবে না। আগে দরকার শরীর আর মনকে ঠিক মত গড়ে তোলা।
আমি একটা কিছু হতে পারি তাহলে একটা পদক কিম্বা নিদেন একছড়া কলা তো পাবো।
তার চেয়েও বেশী কিছুও পেতে পারিস। তোর লাভ হবে দীর্ঘজীবন...
দাঁড়া দাঁড়া। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সঙ্গে জীবন বীমার একটা সম্পর্ক আছে না?
নিশ্চয়ই। আসলে অনেক লোকের গড় আয়ুর উপর ভিত্তি করেই জীবন বীমার ভিত্তি গড়ে উঠেছে।
এসব ব্যাপারে আমি তো বাচ্চা! জীবন বীমার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক বল?
তোর অভিভাবক হিসেবে আমার তো বিষয়টা তোকে জানানো দরকার,
তার মানে?
মানে তোর ভবিষ্যৎ সুরক্ষার দায়িত্ব তো আমার। জীবন বীমার নানা ধরণের প্রকল্প আছে যেমন শিশুদের প্রত্যাশিত বীমা, শিশুদের বিলম্বিত মেয়াদী বীমা, শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যানুয়িটি পলিসি, বিবাহ সংক্রান্ত মেয়াদী বীমা ইত্যাদি। সব পিতামাতা ও অভিভাবকদের এই পলিসি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত
কিন্তু কিভাবে তাঁরা তা জানবেন?
জীবন বীমার এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেই এ বিষয়ে জানতে পারবেন।
তবে চল, এক্ষুনি আমাকে জীবন বীমার এজেন্টের কাছে নিয়ে চল।
WORLD RECORD 3
INK
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
dacnuha/LIC/120/81